Maddhanya by Humayun Ahmed

Part-2

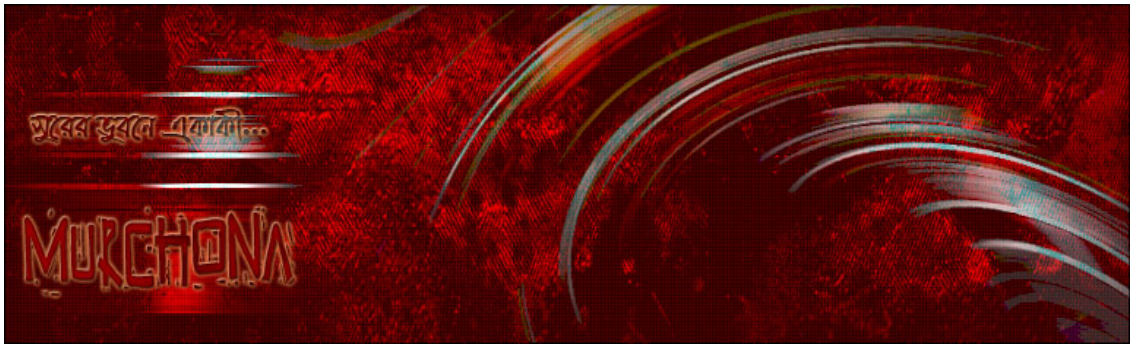

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http//www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

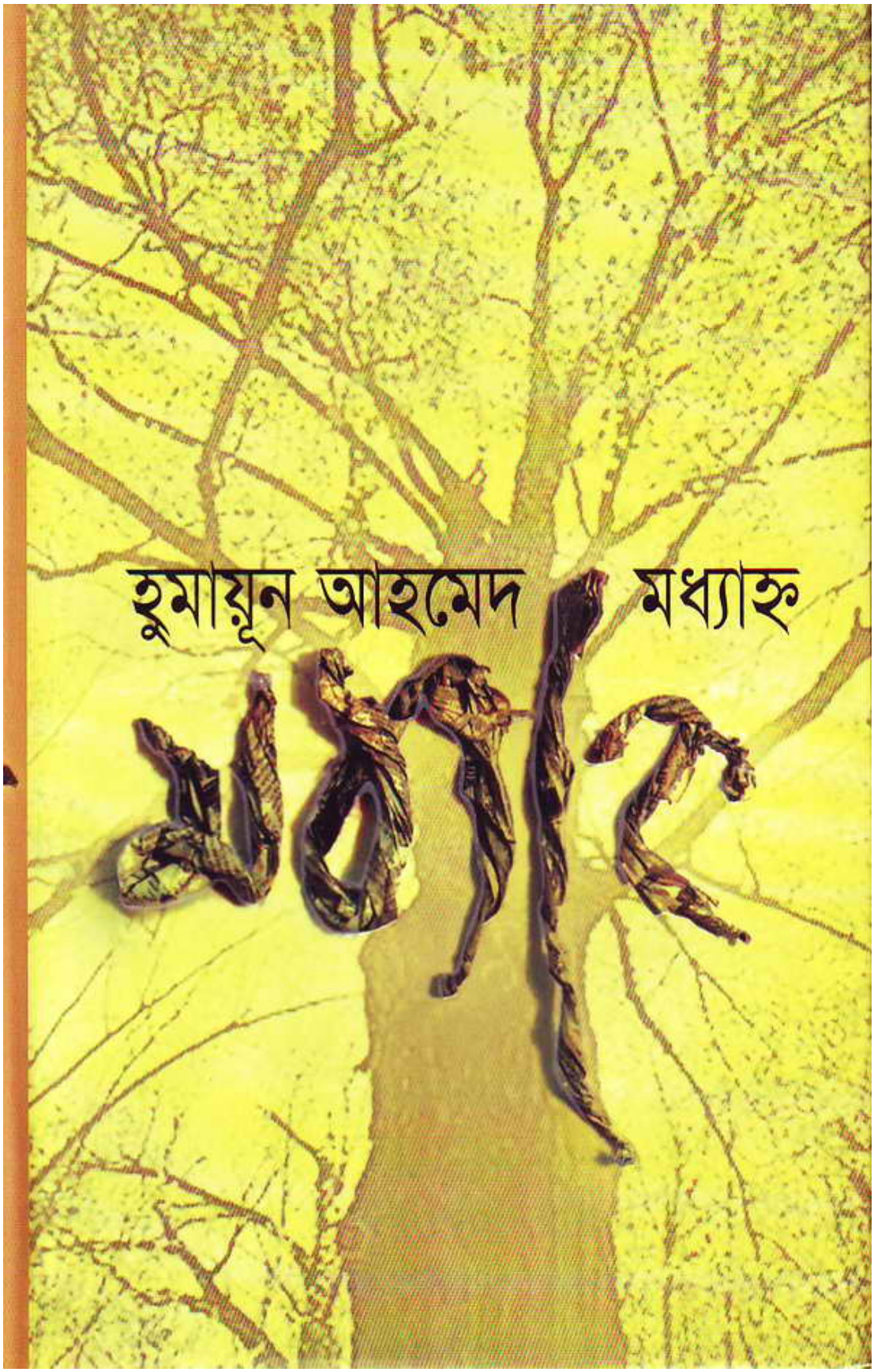
হুমায়ূন আহমেদ
মধ্যাহ্ন

শশী মাস্টার মাছ মারার কনুই জাল নিয়ে বের হয়েছেন। জাল ফেলার কৌশল তাঁর এখনো রপ্ত হয় নি। জালের মুখ গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়ার কথা। তা হচ্ছে না, জাল জড়িয়ে যাচ্ছে। শশী মাস্টারের জেদ চেপে গেছে, তিনি জাল ফেলেই যাচ্ছেন। পুরো কর্মকাণ্ড হচ্ছে শুকনায়, পানিতে না। শশী মাস্টারের কাজ আগ্রহ নিয়ে দেখছে সুলেমান। সে মাস্টারকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসে ফেঁসে গেছে। শুকনায় জাল ফেলার দৃশ্যে সে অভিভূত।

শশী মাস্টার বললেন, তুমি আমাকে কিছু বলতে এসেছ ?

সুলেমান হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। শশী মাস্টার বললেন, বলে ফেলো। কাজের সময় কেউ হা করে তাকিয়ে থাকলে ভালো লাগে না।

আপনার কাজ শেষ করেন, তারপর বলি। অপেক্ষা করি।

শশী মাস্টার জবাব দিলেন না। জাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জালের একটা অংশ হাতের কনুইয়ে জড়িয়ে রাখতে হয় বলেই এর নাম কনুই জাল। জাল ছুড়ে মারার সময় বিশেষ এক মুহূর্তে কনুই নামিয়ে দিতে হয়। সেই বিশেষ মুহূর্ত বের করা যাচ্ছে না বলেই বিপত্তি।

সুলেমান বলল, আমি দেখায়া দেই ?

শশী মাস্টার বললেন, না। কৌশলটা আমি নিজে নিজে বের করব। তুমি কী বলতে এসেছ বলে চলে যাও। হা করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে না। কোনো উপদেশ বা পরামর্শের জন্যে এসে থাকলে 'নো'। আমি উপদেশ দেই না, পরামর্শও দেই না।

সুলেমান বলল, উপদেশ পরামর্শ না। আমি একটা আচানক জিনিস দেখছি। সেই বিষয়ে আপনারে বলতে চাই।

আমাকে বলে লাভ কী ?

আপনি জ্ঞানী মানুষ। আচানক জিনিস ক্যান দেখলাম আপনি বলতে পারবেন। আমি একজন মানুষরে শূন্যে ভাসতে দেখছি।

www.Murchona.com

শূন্যে ভাসতে দেখেছ ?

জে। মাটি থাইকা দুই তিন হাত উপরে সে ভাসতেছে।

শশী মাস্টার বললেন, গাঁজাটা কম খাবে, তাহলে আর এইসব জিনিস দেখবে না। গাঁজা মনে হয় অতিরিক্ত খাচ্ছ।

মাস্টার বাবু, আমি গাঁজা খাই না। অনুমতি দেন পুরা ঘটনাটা বলি। মন দিয়া শোনেন।

শশী মাস্টার অনিচ্ছায় রাজি হলেন। বিরক্তিতে তাঁর ভ্রূ কুঁচকে গেল। অশিক্ষার কারণে এইসব ঘটছে। ভূত-প্রেত, শূন্যে ভাসাভাসি, সবকিছুর মূলে অশিক্ষা। শশী মাস্টার সুলেমানের পাশে এসে বসতে বসতে বললেন, ঘটনা বলো। তবে সংক্ষেপে বলবে। ডালপালা দিয়ে বলবে না। আমি বৃক্ষ পছন্দ করি, ডালপালা পছন্দ করি না।

সুলেমানের ঘটনাটা এরকম— কয়েকদিন আগে সে গিয়েছে হরিচরণের বাড়িতে তার ছেলের সন্ধানে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। মাগরেবের আজান হয় হয়ে গেছে কিংবা এখনি হবে। ছেলেকে সে খুঁজে পেল না। ফিরে আসছে, হঠাৎ চোখ পড়ল হরিচরণ বাবুর দিকে। তিনি পুকুরের শ্বেতপাথরের ঘাটে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। মনে হয় ঘুমাচ্ছেন। ভর সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে থাকা খুব খারাপ, এইজন্যে সে উনাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার জন্যে ঘাটের কাছে গিয়ে থ' হয়ে গেল। কারণ হরিচরণ শূন্যের উপরে শুয়ে আছেন। শ্বেতপাথরের ঘাট তাঁর দুই তিন হাত নিচে। এই হলো ঘটনা।

শশী মাস্টার বললেন, তুমি কী করলে ? তাঁকে ডেকে তুললে ?

সুলেমান বলল, আমি কিছুই করলাম না। দৌড় দিয়া পালায়া আসলাম। হারিকেন জ্বালায়া পরে আরেকবার গেছি। দেখি উনিও লণ্ঠন জ্বালায়ে বই পড়তেছেন।

তাঁকে কি তুমি সন্ধ্যার ঘটনা বললে ?

জে না।

বললে না কেন ?

সাহসে কুলাইল না।

তুমি মদ, ভাং, গাঁজা, আফিম— এর কিছু খাও ?

একবার তো বলছি— না। আমি মুসলমান। আমাদের ধর্মে এইসব খাওয়া নিষেধ আছে।

কোনোদিন খাও নাই ?

একবার আফিং খাইছিলাম। পেটে বেদনা হইছিল। কবিরাজ চাচা বললেন, সরিষার দানা পরিমাণ আফিং দুধে দিয়া তিনদিন খাইতে। আমি দুইদিন খাইছি। দুইদিনেই আরাম হইছে।

হরিচরণ বাবু যে শুয়েছিলেন তাঁর গায়ে কি চাদর ছিল ?

জে না।

মাথার নিচে বালিশ ছিল ?

জে না।

তুমি যা দেখেছ তার নাম ধান্ধা।

ধান্ধা কেন দেখব ?

ধান্ধা দেখার জিনিস তাই দেখেছ। দুনিয়ায় অনেকেই ধান্ধা দেখে। মরুভূমিতে দেখে মরীচিকা। চারদিকে ধুধু বালি— এর মধ্যে দেখে টলটলা পানি।

সুলেমান বলল, পানি দেখা আর মানুষ শূন্যে ভাসতে দেখা তো এক না।

শশী মাস্টার বললেন, জিনিস একই। তোমার মাথার কিছু দোষ আছে, এইজন্যে শূন্যে ভাসা মানুষ দেখেছ।

আরো একজন দেখেছে। তার মাথায়ও দোষ ?

সেই একজন কে ?

সুলেমান চাপা গলায় বলল, সে বিরাট পাপিষ্ঠ। তার নাম মুখে আনাও পাপ। একসময় আমার পরিবার ছিল, এখন নটিবাড়ির নটি। তার জন্যে আমার ইজ্জত গেছে। কাউরে মুখ দেখাইতে পারি না।

শশী মাস্টার অবাক হয়ে বললেন, তার নাম কি জুলেখা ?

হুঁ। এই নাম আমার সামনে নিয়েন না। সেই বান্দি প্রথম দেইখা আমারে বলছিল। সেও হরিবাবুরে একই জায়গা দেখেছে। উনি ঘুমের মধ্যে ছিলেন।

শশী মাস্টার বললেন, তোমার স্ত্রীও ধান্ধাই দেখেছে। তোমাকে বলার পর তোমার মন তৈরি ছিল ধান্ধা দেখতে। যথাসময়ে দেখেছ। এই ঘটনা কি তুমি আর কাউকে বলেছ ?

মাওলানা সাবরে বলেছি। মাওলানা ইদরিস।

উনি কী বলেছেন ?

উনি বলেছেন, দুষ্ট জিনের কাজ।

জিন শুধু শুধু উনাকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখবে কেন ?

সেটা আমি ক্যামনে বলব ? জিনের সাথে তো আমার আলাপ পরিচয় নাই।

শশী মাস্টার বললেন, তুমি এই ঘটনা নিজের মধ্যে রাখবে। কাউরে বলে বেড়াবে না। বলাবলি করলে বিপদ হবে।

কী বিপদ ?

দেশের মানুষ অশিক্ষিত। কুসংস্কারে ডুবে আছে। ঘটনা জানাজানি হলে সবাই ভাববে হরিবাবু বিরাট আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধুপুরুষ। ঝাড়ফুঁকের জন্যে দলে দলে লোক আসবে। কবচ দরকার, ঝাড়ফুঁক দরকার।

সুলেমান বলল, উনার কাছে তো আগে থাইকাই অনেকে যায়। ফুঁ নিতে যায়।

শশী মাস্টার অবাক হয়ে বললেন, কই আমি তো জানি না!

আপনে থাকেন আপনের মতো। জানবেন ক্যামনে ? মাস্টার বাবু, উঠি ? ঘটনা কাউরে বলতে না করছেন, বলব না।

মাধাই খাল যেখানে বড়গাঙে পড়েছে সেখানে বিশাল এক পারুল গাছ। ফুলগুলি জবার মতো দেখতে, রঙ নীল মেশানো হালকা শাদা। শীতের সময় গাছতলা ফুলে ফুলে ঢেকে থাকে। হরিচরণ গাছের নিচটা বাঁধিয়ে দিয়েছেন। শীতের সময় প্রায়ই তিনি বাঁধানো গাছতলায় এসে বসেন। পারুলের হালকা সুঘ্রাণে তাঁর নেশার মতো হয়। মাঝে মাঝে তিনি খাতাপত্র সঙ্গে নিয়ে যান। লেখালেখি করেন। কী মনে করে যেন একটি গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছেন। গ্রন্থের নাম— 'দেবদেবী অভিধান'। গ্রন্থে দেবদেবীর ঠিকুজি কুলিজি লিখছেন। তাদের কর্মকাণ্ডও লিখছেন।

মাঘ মাসের শেষ।

প্রচণ্ড শীত ছিল। আজ হঠাৎ ধপ করে শীত নেমে গেছে। হরিচরণ পারুল গাছের নিচে আয়োজন করে বসেছেন। একটু দূরে কালু মিয়া হাতি নিয়ে অপেক্ষা করছে। জায়গাটা মোটামুটি জনশূন্য। হরিচরণ লিখছেন—

দেবী লক্ষ্মী

> জগত তখনো সৃষ্ট হয় নাই। সনাতন কৃষ্ণের বাম অংশ হইতে এক অপরূপ নারীর সৃষ্টি হইল। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ এই নারী দ্বাদশ বর্ষিয়া বালিকার ন্যায়। মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র সদৃশ।

এই নারীই লক্ষ্মী। তিনি হরিকে স্বামীরূপে কামনা করিলেন। হরি নিজ স্বরূপকে দুই অংশে বিভক্ত করিলেন। এক অংশের নাম চতুর্ভুজ নারায়ণ। অপর অংশ দ্বিভুজ কৃষ্ণ। চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীকে পত্নীরূপে গ্রহণপূর্বক বৈকুণ্ঠে স্থায়ী সংসার গড়িলেন। দেবী লক্ষ্মী স্বর্গলক্ষ্মী হিসেবে অবস্থান করেন স্বর্গে, আবার একই সঙ্গে যোগমহিমায় গৃহলক্ষ্মী হিসেবে অবস্থান করেন মানুষের গৃহে গৃহে।

দেবী রাধা

সনাতন কৃষ্ণের ডান অংশ হইতে সৃষ্ট হইলেন অপরূপা রাধা। তিনিও লক্ষ্মীর ন্যায় হরিকে স্বামীরূপে প্রার্থনা করিলেন। হরির যে অংশ দ্বিভুজ কৃষ্ণ সেই অংশ রাধাকে লীলাসঙ্গীনি হিসেবে গ্রহণ করিয়া গোলকবিহারী হইলেন।

হরিচরণের লেখায় বাধা পড়ল। জেলেপাড়ার মুকুন্দ তার ছেলেকে নিয়ে এসেছে। ছেলের প্রচণ্ড জ্বর। মুকুন্দ ভীতগলায় ডাকল, কর্তা!

হরিচরণ বললেন, তোর খবর কিরে মুকুন্দ ? আছিস কেমন ?

মুকুন্দ বলল, কর্তা আছি ভালা। পুলাটার বেজায় জ্বর। আপনের কাছে নিয়া আসছি।

আমার কাছে কেন ? সতীশ কবিরাজের কাছে নিয়া যা।

আপনে কপালে হাত দিলেই জ্বর কমবে। ডাক্তার-কবিরাজ লাগব না।

হরিচরণ বললেন, আমি কপালে হাত দিলে জ্বর কমবে কেন ?

মুকুন্দ বলল, ভগবান আপনেরে এই ক্ষমতা দিছে। কেন দিছে সেইটা উনার বিষয়। পুলাটার কপালে হাত দেন কর্তা। জ্বরে শইল পুইড়া যাইতেছে।

হরিচরণ মুকুন্দের জ্বরতপ্ত পুত্রের মাথায় হাত রেখে চোখ বন্ধ করে দীর্ঘসময় একমনে পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করলেন। এবং একসময় বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলেন— মুকুন্দের পুত্রের কপালে ঘাম হচ্ছে, জ্বর ছেড়ে দিচ্ছে। এই ঘটনা কেন ঘটছে তার কোনো ব্যাখ্যা তাঁর কাছে নেই। একটাই ব্যাখ্যা— জগত অতি রহস্যময়।

কর্তা!

বল মুকুন্দ।

পুলার জ্বর নাই। শইল পানির মতো ঠাণ্ডা।

হুঁ।

আইজ নাও নিয়া হাওরে মাছ ধরতে যাব। পরথম মাছ যেটা পাব সেটা আপনের জন্যে।

আমার জন্যে মাছ আনতে হবে না। আমি মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

আপনে মাছ খান না-খান আপনের জন্যে নিয়া আসব। আপনের নামে মানত করেছি মাছ একখান যে উঠব।

হরিচরণ লেখায় মন দিলেন। মুকুন্দের খেজুরে আলাপ ভালো লাগছে না। মুকুন্দ যাচ্ছে না। ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে। পিতা-পুত্র মুগ্ধ হয়ে হরিচরণকে দেখছে।

হরিচরণ বললেন, বসে আছিস কেন চলে যা। ছেলেটার গায়ে রোদ লাগাচ্ছিস, আবার জ্বর আসবে।

মুকুন্দ তৃপ্তির গলায় বলল, আসলে আসব। আমরার কবিরাজ এইখানে বসা। কর্তা, আমার পুলা একটা হপন দেখছে। হপন শুনলে আপনে হাসতে হাসতে পেট ফাইট্টা মরবেন।

কী স্বপ্ন ?

হপনে দেখছে হে হাতিতে চইড়া বিয়া করতে যাইতেছে। হা হা হা।

হরিচরণ মাহুত কালুকে ডেকে বললেন, মুকুন্দের ছেলেটাকে হাতিতে করে বাড়িতে দিয়ে আস।

মুকুন্দের মুখ হা হয়ে গেল।

আধমন ওজনের দর্শনীয় এক বোয়াল মাছ মুকুন্দ পৌঁছে দিয়েছে। সেই মাছ রান্না হচ্ছে। রান্না করছে হাতির মাহুত কালু মিয়া। বিশেষ বিশেষ রান্নায় সে পারদর্শী। বড় বোয়াল রান্না করা জটিল ব্যাপার। সামান্য নাড়াচাড়াতেই পেটি ভেঙে যেতে পারে। পেটি ভাঙা মানেই মাছ নষ্ট।

মাছ খাওয়ার দাওয়াত পেয়েছেন মাওলানা ইদরিস এবং শশী মাস্টার। শশী মাস্টার জানালেন যে, তিনি তাঁর জীবনে এত স্বাদু মাছ কখনো খান নি। বোয়ালের মতো নিম্নশ্রেণীর একটা মাছ যে এত স্বাদু হতে পারে এটা তাঁর কল্পনাতেও কখনো আসে নি। মাওলানা ইদরিস মাছ নিয়ে কিছু বললেন না, তবে খাওয়া শেষে হাত তুলে মোনাজাত করলেন— 'হে আল্লাহপাক! যে

বাড়িতে আমার জন্যে এত সুন্দর খাবার আয়োজন হয়েছে তার বাড়িতে যেন এরচেও অনেক সুন্দর আয়োজন প্রতিদিনই হয়।' এই মোনাজাত করতে গিয়ে মাওলানার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তে লাগল।

শশী মাস্টার বললেন, মাওলানা সাহেব, আপনার সঙ্গে আমার সেইভাবে পরিচয় হয় নাই। তবে সর্বজনের কাছে আপনার সুনাম শুনেছি। আপনি যে প্রার্থনা করলেন সেটা শুনেও ভালো লাগল। এ ধরনের প্রার্থনা আমি কাউকে করতে শুনি না।

মাওলানা ইদরিস বললেন, এই ধরনের দোয়া আমাদের নবি-এ-করিম সাল্লালাহু আলাহেস সালাম করতেন। তাঁকে দাওয়াত করে নানা আয়োজনে কেউ যখন খাওয়াত তখন তিনি এই দোয়াটা করতেন।

শশী মাস্টার বললেন, দোয়াটা খুব সুন্দর। কিন্তু আপনি এই দোয়া করতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন কেন, একটু জানতে পারি ?

মাওলানা বললেন, জানতে পারেন। আজ আমার ঘরে কোনো খাবার ছিল না। মাঝে মাঝে এরকম হয়। টিন খুলে দেখি সামান্য চিড়া আছে। মনটা হলো খারাপ। আমি আল্লাহপাককে বললাম, ইয়া আল্লাহ, তোমার বান্দা কি আজ উপাস থাকবে ? আল্লাহপাক সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন। উনার রহমতের নমুনা দেখালেন। আল্লাহপাকের কাছে শুকুর গোজার করতে গিয়ে চোখে পানি এসেছে।

মাওলানার চোখে আবার পানি এসেছে। তিনি চোখ মুছলেন। মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থাকলেন শশী মাস্টার।

রাত ভালোই হয়েছে। হরিচরণের সঙ্গে শশী মাস্টার পুকুরঘাটে বসে আছেন। শীত পড়েছে। চারদিক অন্ধকার করে কুয়াশা পড়েছে। হরিচরণ বললেন, রাত হয়েছে, বাড়িতে যাবে না ?

শশী মাস্টার বললেন, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে বসে আছি।

কিছু তো জিজ্ঞাস করছ না।

অস্বস্তির কারণে জিজ্ঞাস করতে পারছি না।

হরিচরণ বিস্মিত হয়ে বললেন, অস্বস্তি কেন ?

শশী মাস্টার বললেন, আপনি কিছু মনে করেন কি-না এই ভেবে অস্বস্তি। আমি চাই না, আমার কোনো কারণে আপনি মনে কষ্ট পান। আমি আপনাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করি।

কী জিজ্ঞাস করতে চাও জিজ্ঞাস কর।

আপনার বিষয়ে যে অনেক গুজব প্রচলিত এটা কি জানেন ? আপনি গায়ে হাত দিলে অসুখ সেরে যায়। এই ধরনের গুজব।

জানি।

এর কারণ কী ?

হরিচরণ বললেন, কারণ কী আমি জানি না। কারণ নিয়ে মাথাও ঘামাই না। এটাই কি তোমার কথা ?

না। মূল কথা না।

বলো, মূলটা শুনি।

শশী মাস্টার ইতস্তত করে বললেন, আপনি মহাপ্রাণ ব্যক্তি, এই বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। জুলেখা নামের একটি মেয়ে আপনাকে বাবা ডাকত। শুনেছি আপনিও তাকে স্নেহ করতেন।

ঠিকই শুনেছে।

সেই মেয়ে বেশ্যাবাড়িতে স্থান নিয়েছে। আপনার মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তি কিছুই করলেন না। আপনি ইচ্ছা করলেই মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনতে পারতেন। কেন তা করলেন না এটাই আমার জিজ্ঞাসা। প্রশ্নের জবাব দিতে না চাইলে দিতে হবে না। আমি বুঝে নেব।

হরিচরণ বললেন, প্রশ্নের জবাব দিব। মেয়েটির প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা তৈরি হয়েছিল বলে কিছু করি নাই। তাছাড়া মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনলেও লাভ কিছু হতো না। কে গ্রহণ করত এই মেয়েকে। সে পতিতজন। যেখানে সে বাস করছে এর বাইরে তার স্থান নাই। কোনো পুরুষ তাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করবে না। মেয়েটি অসাধারণ রূপবতী। অনেকেই হয়তো তাকে রক্ষিতা হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হবে। তাতে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি কি হবে ?

শশী মাস্টার চুপ করে রইল। হরিচরণ হঠাৎ শশী মাস্টারকে চমকে দিয়ে বললেন, তুমি মেয়েটিকে খুব পছন্দ কর, তাই না ?

শশী মাস্টার বললেন, আপনি কীভাবে জানেন ?

হরিচরণ বললেন, জুলেখার কথা থেকে অনুমান করেছি। তুমি তাকে কলের গান উপহার দিতে চেয়েছ। মোহের কাছে পরাজিত হওয়া ঠিক না। যাও, বাড়িতে যাও। বিশ্রাম কর।

শশী মাস্টার ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন।

হরিচরণ বললেন, পিতামাতার সঙ্গে কি কোনো যোগাযোগ হয়েছে ?

শশী মাস্টার না-সূচক মাথা নাড়লেন। হরিচরণ বললেন, যোগাযোগ করা উচিত। তাঁদের রাগ নিশ্চয়ই এতদিনে পড়ে গেছে। তাঁরা তোমার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছেন।

শশী মাস্টার কিছু বললেন না। হরিচরণ বললেন, আমি কি তাঁদের কাছে একটা পত্র দিব ?

দিতে পারেন।

পত্র লিখে আমি তোমার হাতে দিব। পত্রটা মন দিয়ে পড়ে তুমি যদি মনে করো পাঠানো যায় তাহলে পাঠাবে।

আচ্ছা।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার মন পীড়িত। আমার কথায় যদি মন পীড়িত হয় তাহলে সেটা আমার জন্যে কষ্টের ব্যাপার। আমি তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করি।

শশী মাস্টার বললেন, আমি জানি।

হরিচরণ বললেন, পত্রটা আমি আজ রাতেই লিখে রাখব। পত্রলেখার জন্যে রাত্রি অতি উত্তম।

শশী মাস্টার বললেন, আমি যাই।

কালু মিয়াকে সঙ্গে দিয়ে দেই। এতটা পথ একা যাবে!

শশী মাস্টার বললেন, প্রয়োজন নাই।

ঘন কুয়াশায় শশী মাস্টার হাঁটছেন। উদ্দেশ্যহীন হাঁটা। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ধরে সোজা চলে গেলেন বটকালি মন্দিরের কাছে। কিছুক্ষণ মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে বাজারের দিকে রওনা হলেন। শিমুলতলা থেকে রওনা হলেন হরিবাবুর কাঠের পুলের দিকে। কাঠের পুলের সেগুন কাঠের রেলিং যথেষ্ট চওড়া। পা ঝুলিয়ে বসে থাকা যায়। শশী মাস্টার আগেও কয়েকবার এখানে এসে বসেছেন। যখন আশেপাশে কেউ থাকে না তখন পুলের উপর বসে কবিতা আবৃত্তি করা যায়।

শশী মাস্টার পুলের উপর পা ঝুলিয়ে বসলেন। চোখের সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় মাধাই খাল। চাঁদের আলোয় চকচক করছে। শশী মাস্টারের প্রবল ইচ্ছা করছে ঝাঁপ দিয়ে খালে পড়তে। নিচে বাঁশের খুঁটি পোতা আছে কি-না ভেবে

ঝাঁপ দিতে পারছেন না। শশী মাস্টার কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন—

সূর্য গেল অস্তাচলে, দিগন্ত রেখায়
স্বর্ণ আভা রাখি—
বাবলার শাখা হতে নমি তারি পায়
কহিল জোনাকি

কে, মাস্টার বাবু না ? কী করেন ?

প্রশ্ন করেছে ধনু শেখ। তার চোখে রাজ্যের বিস্ময়। শশী মাস্টার বললেন, কিছুই করি না। জেগে বসে আছি।

নিশি রাইতে জাইগা থাকে দুই কিসিমের মানুষ, সাধু আর শয়তান। আপনি কোন কিসিমের ?

শশী মাস্টার জবাব দিলেন না। ধনু শেখ আগ্রহ নিয়ে বলল, আমি শয়তান। এই কারণেই নিশি রাইতে আমার চলাফেরা। রঙিলা বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিলাম। পেটে উঠেছে বেদনা— ফিরত যাইতেছি। আমার বাড়িতে কি যাবেন ? বিলাতি শরাব ছিল, এক চুমুক দিতেন, শরীর গরম হইত। আপনাদের ধর্মে তো শরাব নিষেধ নাই।

শরাব খাওয়ার ইচ্ছা নাই।

জোয়ান বয়সে এক আধ চুমুক খাবেন না, এইটা কেমন কথা ? ধর্মে যখন নিষেধ নাই তখন কত সুবিধা। আমরার ধর্মে নিষেধ, যে কারণে গোপনে খাইতে হয়।

আপনি তো শুনেছি প্রকাশ্যেই খান।

ঠিকই শুনেছেন। পুলের উপরে বইসা করতেছিলেন কী ?

কবিতা আবৃত্তি করছিলাম। নিজের কবিতা। আমি আবার একজন কবি। শুনবেন কবিতা ?

জে না। কবিতা, গানবাজনা শোনার মতো মনের অবস্থা না। শরীর ভালো না। শরীর ভালো থাকলে শুনতাম। আপনি বাদ্যবাজনা পারেন শুনেছি— একদিন আপনার বাড়িতে গিয়া বাদ্য শুনব। যদি অনুমতি পাই।

অনুমতি দিলাম।

রাগ না করলে একটা উপদেশ দিতাম।

শশী মাস্টার বললেন, উপদেশ শুনতে আমার ভালো লাগে না। তারপরেও দিন, রাগ করব না।

ধনু শেখ গলা নামিয়ে বলল, আপনের জোয়ান বয়স। পুলের উপরে খামাখা বইসা আছেন কোন কামে ? আমার কথা শোনেন, রঙিলাবাড়িতে যান। কুয়াশা যা পড়ছে। কেউ আপনেরে দেখবে না। আর দেখলেই কী ? আমি যাই, পেটের বেদনাটা বাড়তেছে। বেদনা কম থাকলে আরো কিছুক্ষণ গফ করতাম। আপনার বিষয়ে অনেক কিছু শুনেছি— পরিচয় হয় নাই।

কী শুনেছেন ?

আপনে পাগলা মানুষ। পাগলা মানুষ আমার পছন্দ, তবে পাগলা মেয়েমানুষ পছন্দ না। যাই ?

ধনু শেখ চলে যাচ্ছে। শশী মাস্টার তাকিয়ে আছেন। ধনু শেখের পেছনে তিনজন যাচ্ছে। এরা মনে হয় পাহারাদার। একজনের হাতে তালকাঠের বর্শা। এতক্ষণ আড়ালে ছিল। তিনজনের একজন শশী মাস্টারের পরিচিত। অম্বিকা ভট্টাচার্য। বর্তমান নাম সিরাজুল ইসলাম। সে ধনু শেখের অধীনে চাকরি নিয়েছে হয়তো। তার মাথায় কিস্তি টুপি। অন্ধকারে শাদা কিস্তি টুপি জ্বলজ্বল করছে।

জুলেখা সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, আসেন গো। মনে হয় আপনেরে 'জারে' ধরছে (শীতে ধরেছে), কাঁপতেছেন। এমন শীত তো নাই। আসেন আসেন। পানি দিতেছি, হাত-মুখ ধোন।

শশী মাস্টার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ইচ্ছে করছে দৌড়ে পালিয়ে যেতে। সেটা সম্ভব হচ্ছে না। পা স্থানু হয়ে আছে। দরজার গোড়ায় পিতলের দু'টা কুপি জ্বলছে। জুলেখার হাতে কাশেমপুরি পেটমোটা হারিকেন। এই হারিকেন শাদা কেরোসিনে জ্বালাতে হয়। এর আলো হ্যাজাকবাতির মতো উজ্জ্বল। হারিকেনের আলো পড়েছে জুলেখার মুখে। তাকে ইন্দ্রানীর মতো দেখাচ্ছে। পানের রঙে ঠোঁট লাল। চোখে কাজল। কাজলের কারণেই চোখ হয়েছে বিষণ্ন। জুলেখা বলল, আপনি যে আসবেন আমি জানতাম।

শশী মাস্টার বললেন, কীভাবে জানতে ?

ঘরে আইসা বসেন তারপরে বলি।

ঘরে ঢুকব না জুলেখা।

দোয়ার থাইকা চইলা যাবেন ?

হ্যাঁ। ঘোরের মধ্যে চলে এসেছিলাম।

ঘোর কি কাটছে ?

শশী মাস্টার জবাব দিলেন না। তাঁর ঘোর কাটে নি, বরং বাড়ছে। জুলেখা বলল, আপনে আমার গান শুনতে চাইছিলেন। আইজ গান শুনবেন ? বিচ্ছেদের গান। উকিল মুনসির বিচ্ছেদি।

শশী মাস্টার দাঁড়িয়ে আছেন। এই শীতেও তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জুলেখা হাত ধরে তাঁকে ঘরে ঢুকাল।

কী সুন্দর পরিপাটি ঘর! সামান্য আসবাব। কার্তিকের মূর্তির সামনে পাথরের ফুলদানিতে টকটকে লাল রঙের জবাফুল। ফুল এখনো সতেজ। বিছানায় বকুলফুল ছড়ানো। হালকা মিষ্টি ঘ্রাণ আসছে।

তুমি জানতে যে আমি কোনো একদিন আসব ?

হুঁ।

কীভাবে জানতে ?

আপনের চোখে লেখা ছিল। আমি চোখের লেখা পড়তে পারি।

এখন আমার চোখে কী লেখা ?

এখন কিছু লেখা নাই ?

নিশ্চয়ই লেখা আছে। পড় কী লেখা।

জুলেখা বলল, এখন আপনের চোখে লেখা— আমি বাকি জীবন এই মেয়েটার সঙ্গে থাকব। এরে ছাইড়া যাব না। লেখা ঠিকমতো পড়ছি না ?

শশী মাস্টার জবাব না দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। তাঁর প্রচণ্ড পানির পিপাসা পেয়েছে। মনে হচ্ছে বুক শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে।

জুলেখা, জল খাব।

একটু ঠাণ্ডা হন তারপর খান।

শশী মাস্টার বললেন, আমার ভিন্ন একটা পরিচয় আছে। পরিচয়টা তোমাকে দিতে চাচ্ছি।

কেন ?

তোমাকে গোপন কিছু বলতে ইচ্ছা করছে। আমার নাম শশী না। আমার নাম কিরণ গোস্বামী। বিপ্লবী কিরণ গোস্বামী। আমি একজন ইংরেজ সাবজজ এবং দু'জন ইংরেজ কনস্টেবল বোমা মেরে মেরেছি। এখন আমি পলাতক। আমার অনুপস্থিতিতে বিচারে আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। ইংরেজ পুলিশ আমাকে ধরতে পারলেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে।

জুলেখা বলল, আপনে ঘামতেছেন। একটু বাতাস করি ?

করো। জল খাব।

একগ্লাস শরবত বানায়ে দেই ? লেবুর শরবত ?

দাও।

জুলেখা শরবতের গ্লাস নিয়ে এসে দেখে, শশী মাস্টার বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। বাচ্চাদের মতো হাত-পা কুণ্ডুলি পাকিয়ে আছে। তৃষ্ণা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া ঠিক না। ঘুমুতে যেতে হয় যাবতীয় তৃষ্ণা মোচনের পর। জুলেখা কী করবে বুঝতে পারছে না। সে কি এই মানুষটাকে ডেকে তুলবে ?

হরিচরণ রাত জেগে শশী মাস্টারের বাবাকে একটি চিঠি লিখছেন—

মহাশয়,

সম্মানপ্রদর্শন পূর্বক নিবেদনমিদং। অধীনের নাম হরিচরণ। আপনার আদরের সন্তান শশী আমার আশ্রয়ে আছে। নিরাপদে আছে। সে আপনাদের সান্নিধ্যের জন্যে অতিব ব্যাকুল। আমি সিদ্ধান্ত নিয়াছি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিব...

বান্ধবপুর গ্রামের নৌকাঘাটায় চৈত্রমাসের এক সকালে ছইওয়ালা একটা নৌকা ভিড়েছে। নৌকার আরোহী তরুণ এক যুবাপুরুষ। তার চোখে বাহারি চশমা। গাত্রবর্ণ গৌর। এই গরমেও তার গায়ে ঘিয়া রঙের চাদর। কালো চামড়ার একটা ব্যাগ তার সঙ্গে। নৌকা ঘাটে ভেড়ার পরও যুবাপুরুষ নৌকা থেকে নামছে না। কাছেই কোথাও গুলির শব্দ হচ্ছে। একটা শব্দ না। অনেক শব্দ।

এই নিস্তরঙ্গ গহীন গ্রামে গোলাগুলির শব্দ হবে কেন ? যুবাপুরুষ অবাক হয়ে নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞেস করল, শব্দ কিসের গো ?

মাঝি বলল, শিমুল ফুলের বিচি ফাটতাছে। এই অঞ্চলে শিমুল গাছ বেশি। মাছহাটায় আছে সাতটা শিমুল গাছ।

যুবাপুরুষ ব্যাগ হাতে নৌকার ছইয়ের ভেতর থেকে বের হয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। গাছ থেকে মেঘের ছোট ছোট খণ্ডের মতো শিমুল তুলা বিচি ফেটে বের হচ্ছে, বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। তার কাছে মনে হলো, সে তার জীবনে এত সুন্দর দৃশ্য দেখে নি।

মাঝি বলল, আপনে যাবেন কই ?

শশী মাস্টারের কাছে যাব। শশী মাস্টারকে চেন ?

চিনব না কী জন্যে ? উনারে কে চিনে না বলেন। পাগলা মাস্টার।

পাগল না-কি ?

বিরাট পাগল। চরের বালি দিয়া শরীর ঢাইক্যা শুইয়া থাকে। সারারাইত হাঁটে।

কেন ?

ক্যামনে বলব ? পাগল মানুষের কাজের কোনো ঠিকানা থাকে না। তয় লোক ভালো। শিক্ষক ভালো। আমার এক পুলা তার স্কুলে যায়। পুলার নাম তমিজ মিয়া।

বাহ্, সুন্দর নাম।

www.Murchona.com

আপনার নাম কী ?

আমার নাম মফিজ। মোহাম্মদ মফিজ।

মাঝি অবাক হয়ে বলল, আপনি মুছলমান ?

নাম শুনে কী মনে হয় ?

আমি ভাবছিলাম আপনে হেন্দু। আপনের চেহারার মধ্যে হেন্দু আছে।

আমার গালে দাড়ি দেখছ না ?

অনেক হেন্দুর মুখেও দাড়ি আছে। শশী মাস্টারের গালেও দাড়ি।

শশী মাস্টারের কাছে যাব কীভাবে বলে দাও।

বাজারের রাস্তা বরাবর যাবেন। শেষ মাথায় দেখবেন ডাইনে এক রাস্তা। বাঁয়ে আরেকটা। ডাইনের রাস্তায় যাবেন। জুম্মাঘর পাইবেন। জুম্মাঘরে মাওলানা ইদরিস সাহেবরে পাইবেন, সে পথ বাতলায়া দিবে। পাগলা মাস্টার নদীর ধারে ঘর বানায়া একলা থাকে। হরিবাবুর বাড়ি পুরা খালি। সেখানে থাকবে না। তার নাকি 'জল' না দেখলে ঘুম আসে না।

মোহাম্মদ মফিজ নৌকা থেকে নামল। শিমুল গাছের নিচ থেকে কিছু তুলা কুড়ালো, তারপর হাঁটতে শুরু করল। আজ হাটবার না থাকায় দোকানপাট বেশিরভাগই বন্ধ। যুবাপুরুষকে কেউ লক্ষ করল না।

এই রূপবান যুবাপুরুষের আসল নাম জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়। বাড়ি ঢাকা জেলার পাত্রসারে। পিতা জানকিনাথ। ১৯০৭ সনে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রথম গ্রেপ্তার হন। প্রমাণাভাবে ছাড়া পান। আলীপুর বোমা মামলার পর বাঘা যতীনের সংস্পর্শে আসেন। এখন তিনি পলাতক। পুলিশ ভয়ানক সন্ত্রাসী হিসেবে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার মাথার দাম পাঁচ হাজার টাকা ঘোষণা করেছে। জীবনলাল এসেছেন আত্মগোপন করতে।

মাওলানা ইদরিস মসজিদের সামনে কাঠের টুলে বসে আছেন। তাঁর চোখেমুখে মুগ্ধতা। মুগ্ধতার কারণ মসজিদের টিউব কল। হরিচরণ এই টিউবওয়েল করে দিয়ে জায়গাটা বাঁধিয়ে দিয়েছেন। লোকজন পাত্র নিয়ে পানি নিতে আসে, তাঁর দেখতে খুব ভালো লাগে। আল্লাহর অসীম রহমতে পানি বের হয়েছে অতি স্বাদু। যে একবার এই পানি খাবে, তার স্বাদ মনে থাকবে। তাঁর মনে একটাই কষ্ট— হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ পানি নিতে আসছে না। পানির তো আর হিন্দু মুসলমান নেই। মসজিদের টিউব কলের পানি যে-কেউ খেতে পারে। হিন্দুরা খায় না। ন্যায়রত্ন রামনিধি ঘোষণা দিয়েছেন, যে এই জল পান করবে সে মহাপাতকি হবে।

আসসালামু আলায়কুম!

মাওলানা ঘাড় ঘুরিয়ে অচেনা আগন্তুককে দেখলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বিনয়ের সঙ্গে বললেন, ওয়ালাইকুম সালাম। জনাব, আপনার পরিচয় ?

আমার নাম মোহাম্মদ মফিজ। আমি বাবু হরিচরণের স্কুলের নতুন শিক্ষক।

মাওলানার মন আনন্দে পূর্ণ হলো। আশেপাশের অঞ্চলের কোনো স্কুলেই মুসলমান শিক্ষক নেই। এই প্রথম একজন পাওয়া গেল। মাওলানা এগিয়ে গেলেন। হাত মেলালেন।

শশী মাস্টারের বাড়িতে যাব। কোনদিকে যাব যদি বলে দেন।

মাওলানা বললেন, আমি নিজে আপনাকে নিয়ে যাব। প্রথম এই অঞ্চলে এসেছেন, জুম্মাঘরের সীমানায় পা দিয়েছেন, দুই রাকাত নফল নামাজ পড়েন, তারপর চলেন আপনাকে নিয়ে যাই। আপনার দেশের বাড়ি কোথায় ?

জব্বলপুর।

শুনে খুশি হলাম। আপনি কোন মাজহাবের ?

আমি হানাফি। ইমাম আবু হানিফার মাজহাব।

আলহামদুলিল্লাহ। আমি নিজে হানাফি মাজহাবের। একটা কথা বলব, যদি কিছু মনে না নেন।

অবশ্যই বলবেন।

আপনি অল্পবয়সে সুন্নতি দাড়ি রেখেছেন দেখে ভালো লাগছে। কিন্তু ভাই সাহেব, দাড়ির সঙ্গে গোঁফ রাখা ঠিক না। আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হেস সালাম গোঁফ রাখতেন না। দাড়িগোঁফ একসঙ্গে রাখা সুন্নতের বরখেলাফ। কোনো খাদ্যদ্রব্যের সাথে যদি গোঁফের স্পর্শ হয় সেই খাদ্যদ্রব্য নাপাক হয়ে যায়।

আগুন্তুক বলল, আমার মায়ের কারণে গোঁফ রাখতে হয়েছে। মা বলেন গোঁফ ছাড়া দাড়িতে আমাকে না-কি খুবই খারাপ দেখায়।

তাহলে ঠিক আছে। মায়ের মনে কষ্ট দেয়া কোনোক্রমেই ঠিক না। নবিজির হাদিস আছে— 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।' আপনার কি অজু আছে ? না-কি অজু করবেন ?

অজু করব।

আসেন অজু করেন। আমি কল চাপব। এই কল নতুন বসানো হয়েছে। অতি সুমিষ্ট পানি। এক চুমুক খেলে দিল ঠাণ্ডা হয়।

মাওলানা তাকিয়ে আছেন। আগন্তুক অজু ঠিকমতো করতে পারছে কি-না এটাই তাঁর দেখার বিষয়। বেশিরভাগ মানুষ অজু ঠিকমতো করতে পারে না। হাতে ধরে অজু শেখাতে হয়। অজুর দোয়া শেখাতে হয়।

আপনি কি অজুর নিয়ত জানেন ?

আরবিতে জানি না। নিয়ত বাংলায় পড়ি।

বাংলায় পড়লেও হবে। সোয়াব সামান্য কম হবে। আমি আপনাকে আরবি নিয়ত শিখায়া দিব।

আগুন্তুক বললেন, শুকরিয়া।

আগন্তুক সুষ্ঠুমতে অজু করল। মাওলানা আনন্দ পেলেন।

মোহাম্মদ মফিজ শশী মাস্টারের বাড়ি দেখে বলল, বাহ্।

শশী বলল, বাহ্ মানে কী ? আনন্দের বাহ্ না অবজ্ঞার বাহ্ ?

মফিজ বলল, বিস্ময়ের বাহ্। তোর বাড়িঘর দেখে মনে হচ্ছে ইংরেজ থাকুক ইংরেজের মতো। আমরা এইখানে জীবন পার করে দেই। মৎস্য মারিব খাইব সুখে।

শশী মাস্টার বলল, এক্কেবারে আমার মনের কথা।

মফিজ বলল, এটা কি তোর মাছ মারার জায়গা ?

হুঁ। সুন্দর কি না বল ?

'বাহ্' টাইপ সুন্দর।

মাছ ধরার জায়গাটা বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া। হিজল গাছের বড় দু'টা ডাল মাধাইখালের উপর দিয়ে কিছুদূর যাবার পর উপরের দিকে উঠেছে। ডাল দু'টার উপর পাটাতন বিছিয়ে মাছ ধরার জায়গা করা হয়েছে। রোদ যেন মাথায় না লাগে সেই ব্যবস্থাও আছে।

শশী মাস্টার বলল, নিজের হাতে মাছ ধরি, রান্না করি।

মফিজ বলল, কাজকর্ম না থাকলে তুই না-কি চরের বালি মেখে শুয়ে থাকিস ?

হুঁ। বালু চিকিৎসা।

এতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আমাদের উচিত লো প্রোফাইলে থাকা, দৃষ্টি আকর্ষণ করা না।

শশী মাস্টার বলল, আমি একমত হলাম না। হাই প্রোফাইলের মানুষ সবসময় চোখের সামনে থাকে বলে তাদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। কৌতূহল তৈরি হয় লো প্রোফাইলের মানুষের দিকে।

মফিজ বলল, বিনোদের ফাঁসি হয়েছে, খবর পেয়েছিস ?

হুঁ।

ফাঁসির সময় হঠাৎ না-কি খুব ভড়কে গিয়েছিল। চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছিল। কিছুতেই ফাঁসিতে ঝুঁলবে না। টেনে হিঁচড়ে তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে।

শশী মাস্টার বলল, গাধা।

গাধা তো বটেই। এতে অন্য বিপ্লবীদের মন দুর্বল হয়। ভালো কথা, আমার থাকার জায়গা কি তোর এখানে ?

না। আমি সাত্বিক ব্রাহ্মণ। তোর মতো যবনকে নিজের বাড়িতে স্থান করে দেব কেন! তুই থাকবি ঋষি হরির বাড়িতে।

ঋষি হরিটা কে ?

যার স্কুলের আমি শিক্ষক তাঁর নাম হরিচরণ। লোকে তাঁকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন সাধুপুরুষ হিসেবে জানে। যদিও তিনি জাতিচ্যুত। ধর্মচ্যুত। ভালো কথা, তুই থাকবি কতদিন ?

জানি না কতদিন। তবে তোকে চলে যেতে হবে। তোর ডাক এসেছে। নতুন মিশন।

কবে যেতে হবে ?

শিগগিরই যেতে হবে। তুই যাবি চট্টগ্রামে। মাস্টারদার সঙ্গে যোগ দিবি।

গুড। গেটআপ ভালো নিয়েছিস। দেখেই মনে হচ্ছে, অতি ধর্মপ্রাণ মাওলানা। নামাজের নিয়মকানুন জানিস ?

অবশ্যই।

শশী মাস্টারের বর্শিতে মাছ ধরা পড়েছে। সে বর্শি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মাছের ঝাঁপাঝাঁপিতে মনে হচ্ছিল বিশাল কোনো মাছ। দেখা গেল বিশাল কিছু না, মাঝারি আকৃতির আড় মাছ।

শশী মাস্টার বলল, আমার মায়ের কোনো খবর রাখিস ?

না। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

তোর বাবা মা'র খবর কী ?

জানি না। তোর গানাবাজনা কি চলছে ?

হুঁ।

তোর জন্যে দু'টা রেকর্ড এনেছি। কানা কেস্টর কীর্তন। এখনই বের করে দেব, না পরে নিবি ?

এখন দে। সেলিব্রেট করি।

সেলিব্রেশনটা কিসের ?

দুই বন্ধুর মিলন।

কলের গানে গান বাজছে। দুই বন্ধু পাশাপাশি বসে আছে।

তনু যৌবনে তপন তটিনি
খেলে। কৃষ্ণ দ্বীজ যায়...
যমুনায়, যমুনায়।...

শশী মাস্টার গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলল, ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে আমি প্রথম কাজ কী করব জানিস ? বিবাহ করব।

অতি উচ্চশ্রেণীর কোনো চিন্তা বলে তো মনে হচ্ছে না।

এটা যে কত বড় উচ্চশ্রেণীর চিন্তা বিবাহের পর বুঝতে পারবি। পতিত কন্যা বিবাহ করব।

ডোম কন্যা ? অচ্ছুৎ ?

শশী মাস্টার জবাব না দিয়ে দ্বিতীয় রেকর্ডটি কলের গানে রাখল।

মোহাম্মদ মফিজের স্থান হলো হরিচরণের বাড়িতে।

শশী মাস্টার ব্যবস্থা করে দিলেন। শশী মাস্টার বললেন, মোহাম্মদ মফিজ আমার পরিচিত। জব্বলপুরের মানুষ। শহরের নোংরা আবহাওয়ায় শরীর খারাপ করেছে বলে কিছুদিন গ্রামে থাকবেন। আমি বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাব। আমার অনুপস্থিতিতে উনি ছাত্র পড়াবেন।

হরিচরণ বললেন, কোনো অসুবিধা নাই। যতদিন ইচ্ছা থাকবেন। আমার বাড়ি তো খালি পড়ে আছে।

অতিথিকে হরিচরণের পছন্দ হলো। নির্বিরোধী ভালো মানুষ। পড়াশোনায় খুবই আগ্রহ। বেশিরভাগ সময় বই নিয়ে আছেন। বই পড়ার স্থানও বিচিত্র। কখনো পুকুরঘাটে, কখনো শতরঞ্চি পেতে শিউলিতলায়, আবার কখনো বা বই হাতে হাঁটতে হাঁটতে পড়া। হরিচরণের সঙ্গে অতিথির কথাবার্তা হয় না বললেই চলে। মানুষটা স্বল্পবাক।

টুকটাক কথা যা হয় খাবার সময় হয়। একদিন মফিজ বললেন, শুনেছিলাম আপনার দু'টা হাতি আছে। হাতি কই ?

হরিচরণ বললেন, পুরুষ হাতিটা বিক্রি করে দিয়েছিলাম। দু'টা হাতি বাহুল্য ভেবেছি। মেয়ে হাতিটা আসামের জঙ্গলে পাঠিয়েছি। পুরুষ সঙ্গী খুঁজে বের করবে। কিছুদিন তার সাথে থাকবে, তারপর গর্ভবতী হয়ে ফিরে আসবে।

মফিজ বললেন, এও কি সম্ভব!

হরিচরণ বলল, সম্ভব কি-না জানি না। একটা পরীক্ষা বলতে পারেন। হাতির অন্তরে মায়াভাব প্রবল। সে গৃহকর্তার কাছে ফিরে আসে। গৌরীপুরের মহারাজার একটা মাদী হাতি পালিয়ে আসামের জঙ্গলে চলে গিয়েছিল। গর্ভবতী হয়ে সে মহারাজার কাছে ফিরে আসে। হাতি জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসার বুদ্ধি সেখান থেকে পাওয়া।

আপনার এই জংলি বাগান অতি মনোহর। কত ধরনের গাছ আপনার আছে জানেন ?

না।

আমি গাছের একটা পূর্ণ তালিকা তৈরি করছি। আপনার এখানে কিছু দুর্লভ গাছ আছে। কর্পূর গাছ যে আছে আপনি জানেন ?

না। আমার বাবার গাছের শখ ছিল, তিনি নানান জায়গা থেকে গাছ এনে লাগিয়েছিলেন। আমার গাছের শখ নাই।

আপনার কিসের শখ ?

আমার কোনোকিছুর শখ নাই। তবে আপনার গাছের প্রতি আগ্রহ দেখে ভালো লাগল।

আমাদের নবিজির গাছপালার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। একটা হাদিসে আছে তিনি বলেছেন— 'তুমি যদি জানো পরের দিন রোজ কেয়ামত, তারপরেও একটা গাছ রোপণ করো।'

হরিচরণ মুগ্ধ গলায় বললেন, বাহ্ সুন্দর কথা তো!

মফিজ বললেন, নবিজির অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আছে। আপনি আগ্রহী হলে আমি আপনাকে বলব।

হরিচরণ বললেন, আরেকটা বলুন।

মফিজ বললেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আরবের অন্ধকার যুগে কন্যা শিশুদের নানাভাবে নির্যাতন করা হতো। অনেককে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। নবিজি সারাজীবন চেষ্টা করেছেন শিশুকন্যাদের মঙ্গল করতে। তাঁর একটা হাদিস আছে, তিনি বলেছেন— 'যারা শিশুকন্যাদের জন্যে কোনো উপহার নিয়ে আসে, তারা যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে খাদ্যসামগ্রী আনার মতো পুণ্যের কাজ করে।'

হরিচরণ বললেন, আপনার তো ধর্ম বিষয়ে অনেক জানাশোনা, কিন্তু আপনাকে ধর্মকর্ম করতে দেখি না। মুসলমানদের দৈনিক পাঁচবেলা নামাজ পড়ার বিধান আছে বলে শুনেছি।

ঠিকই শুনেছেন। আমি সেরকম ধার্মিক মানুষ না। আমি শুধু জুম্মাবারে মসজিদে যাই। এখন আপনি যদি বিব্রত না হন, তাহলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি ?

করুন।

আপনি ধর্মচ্যুত হয়েছেন বলে শুনেছি। আপনি আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন না কেন ?

হরিচরণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সমাজ আমাকে ধর্মচ্যুত করেছে। আমি তো নিজেকে করি নাই।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতে পারেন। অনেক বিশিষ্টজন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একজন।

ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে আমি কিছু জানি না।

আপনি অনুমতি দিলে এই বিষয়েও আপনাকে কিছু বলব।

ব্রাহ্মধর্মের বিষয়ে আমি জানতে চাই।

আমি যা জানি আপনাকে বলব। এই ধর্মের প্রচলন করেন রাজা রামমোহন রায়। ইসলামধর্ম এবং খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে উনার প্রচুর জ্ঞান ছিল। এই ধর্মে প্রভাবিত হয়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম শুরু করেন। এই ধর্মের মূল বিষয় একেশ্বরবাদ। ব্রাহ্মরা মূর্তিপূজার ঘোরবিরোধী। আপনি জনহিতকর কাজ করতে চান এমন শুনেছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করবেন ?

হরিচরণ বিস্মিত হয়ে বললেন, তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন কী ?

তিনি বিশ্বভারতী নামের ইউনিভার্সিটি শুরু করেছেন। তাঁর প্রচুর অর্থ প্রয়োজন।

আমার মতো অভাজনের অর্থ কি তিনি গ্রহণ করবেন ?

অবশ্যই করবেন। আমি কি আপনার হয়ে অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা করব ?

করলে ভালো হয়।

হরিচরণ আনন্দিত। এই তরুণের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান তাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি বিস্মিত।

বান্ধবপুরের আরো একজনকে মফিজ বিস্মিত করল। তার নাম ইদরিস। মসজিদের ইমাম। জুম্মার দিনে, নামাজের পরে দু'জন বসে থাকেন। ধর্মের

নানান খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। মফিজ ধর্ম নিয়ে নবিজিকে নিয়ে নানান কথা বলেন। মাওলানা ইদরিসের বড় ভালো লাগে। নবিজি কখনো তসবি পড়তেন না, হাতের আঙুলে গুনতেন— এই তথ্য মাওলানা ইদরিস জানতেন না। নবিজি ঘাড় পর্যন্ত উঁচু একটা লাঠি সবসময় ব্যবহার করতেন, এই তথ্যও মাওলানা ইদরিসের অজানা। তিনি জানতেন নবি হযরত মুসা আলায়হেস সালামই শুধু লাঠি ব্যবহার করতেন— যে লাঠি মাটিতে ফেললে সাপ হয়ে যেত।

জুম্মাবারে নামাজ পড়ার কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রায় সবার সঙ্গেই মোহাম্মদ মফিজের সখ্য হলো। সবচে' বেশি হলো ধনু শেখের সঙ্গে। ধনু শেখের বাড়িতে যে-কোনো উৎসবে মোহাম্মদ মফিজের ডাক পড়ে। ছেলের খৎনা, মেয়ের জন্ম উপলক্ষে আকিকা, অন্য কেউ থাকুক না-থাকুক মোহাম্মদ মফিজ আছে। খাওয়া-দাওয়ার শেষে খাসকামরায় গল্পগুজব।

ধনু শেখ পান চাবাতে চাবাতে হুক্কার নল টানতে টানতে দরাজ গলায় বলে, মফিজ ভাই! আমি যে দিলখোলা লোক এইটা বুঝেন তো ? পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ সবদিক আমার খোলা।

মফিজ বলেন, শুধু চারদিক কেন ? বাকি ছয়দিকও আপনার খোলা।

বাকি ছয়দিক কী ?

ঈশান, নৈঋত, বায়ু, অগ্নি, ঊর্ধ্ব, অধ।

বাহবা। আপনার তো জ্ঞানের সীমা নাই। আমি মূর্খ, মহামূর্খ। তবে এমন মূর্খ যার ধন আছে।

শুধু ধন না, বুদ্ধিও আছে। বুদ্ধি বিনা ধন আসে না।

মারহাবা। ভালো বলেছেন। এইজন্যেই আপনাকে পিয়ার করি। আমার বুদ্ধি কেমন সেই বিষয়ে একটা গল্প শুনবেন ?

শুনব।

ধনু শেখ গলা নামিয়ে বলল, আপনাকে অতি আপনা লোক ভেবে বলতেছি। আর কাউরে এই ঘটনা বলা যাবে না। যৌবন বয়সে এই বুদ্ধি মাথায় আসল। কোনো হিন্দুমেয়েকে যদি কোনোরকমে পাট খেতে ঢুকায়ে ফেলা যায়, তার সঙ্গে কুকর্ম করা যায়, সে এই কথা প্রকাশ করবে না। প্রকাশ করলে তার জাত যাবে। তার গুষ্ঠির জাত যাবে। কাজেই কুকর্মের কথা কেউ জানবে না।

মফিজ বললেন, বুদ্ধিমতো কাজ করেছেন ?

কয়েকবার করেছি। যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে। কেউ মুখ ফুটে কিছু বলে নাই। হিন্দুর কাছে জাত বিরাট জিনিস। ঠিক না ?

হুঁ।

বুঝেছি কাজটা অন্যায়। দুষ্টু বয়সে কিছু অন্যায় সবাই করে। আমিও করেছি। পাপ হয়েছে মানি। সেই পাপ কাটান দেয়ার ব্যবস্থা নিয়েছি।

কী ব্যবস্থা ?

এই অঞ্চলে মাদ্রাসা দিব। মাদ্রাসায় তালেবুল এলেমরা আল্লাখোদার নাম নেবে। তারা যে সোয়াব কামাবে তার একটা অংশ আমি পাব। ভালো বুদ্ধি না ?

হুঁ।

আরো ব্যবস্থা রেখেছি। প্রতি ঈদুল ফিতরের নামাজের আগে আমি তওবা করি। এতে আগের সব পাপ কাটা যায়। নিষ্পাপ অবস্থা শুরু হয়। বুদ্ধি ঠিক আছে না ?

যিনি পাপ পুণ্য দেন তিনি কি আর আপনার কূটবুদ্ধি বুঝবেন না ?

তাও ঠিক। তারপরেও চেষ্টা চালায়ে যাব। কোনো এক ফাঁক দিয়ে বের হয়ে যাব। কনি জাল ফেলার পরে জাল যখন টানা হয়, তখন দেখা যায় কিছু মাছ ফাঁক দিয়ে আরামসে বের হয়। হয় না ?

হয়।

মাদ্রাসার ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। টাইটেল পাশ মাওলানা রাখব। ছাগলা ইদরিসকে দিয়ে কাজ হবে না।

ইদরিস মাওলানা মানুষ হিসেবে প্রথম শ্রেণীর।

ইদরিস মানুষ খারাপ এইটা আমি বলব না, তবে তার প্রধান দোষ— মালাউনরে তোয়াজ করা। মালাউনরে তোয়াজের কী আছে ?

মফিজ বললেন, হিন্দুদের প্রতি আপনার এই প্রবল বিদ্বেষের কারণ কী ?

কারণ একটাই— এরা মুসলমানদের মানুষই মনে করে না। মনে করে আমরা কুকুরের অধম। ছোটবেলায় এক মিষ্টির দোকানে ভুলে ঢুকে পড়েছিলাম। ময়রা কী করল শুনেন। দোকানের সব মিষ্টি নিয়ে পুকুরে ফেলল। আমারে মারতে মারতে মিষ্টির উপরে ফেলল। কেউ কিছুই বলল না। মুসলমানরাও না। আফসোস কি-না বলেন ?

অবশ্যই আফসোস।

বদগুলা স্বরাজ স্বরাজ করতেছে। স্বরাজ আসুক, পিটায়া লাশ বানাব। ইংরাজ পুলিশের ভয়ে এখন কিছু করতে পারতেছি না। হিসাব মতো হিন্দুস্থানের মালিক আমরা। দিল্লির সিংহাসন ছিল আমাদের। যদি স্বরাজ হয়, হিন্দুস্থানের নাম বদলায়া করব— মুসলমান স্থান।

সপ্তাহে একদিন হরিচরণের কাছে 'কলিকাতা গেজেট' নামের পত্রিকাটি আসে। মফিজ পত্রিকাটি অতি আগ্রহের সঙ্গে পড়েন। বিপ্লবীরা কোথায় কী করছে সব খবর পাওয়া যায়। পুলিশের কর্মকাণ্ডের খবরও থাকে।

ব্রিটিশ সিংহ কিছুটা নরম হয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছে। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের ভারতবাসীর সমর্থন দরকার। তাদের ভাবভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে, তারা যুদ্ধে জিতলে কিছুটা ছাড় দেবে। অনেকেই ব্রিটিশদের কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম তখন শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্র। তিনি পড়াশোনা বাদ দিয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে নিজেকে সরাসরি যুক্ত করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বঙ্গদেশের মুসলমানদের জন্যে শুভ হয়েছিল। মুসলমানদের বড় অংশ চাষী শ্রেণীর। পাট তাদের প্রধান কৃষিপণ্য। যুদ্ধের কারণে পাটের দাম লাফিয়ে বাড়তে শুরু করে। পাঁচ টাকা মণ থেকে সত্তর টাকা মণে পৌঁছে যায়।

হতদরিদ্র চাষী মুসলমান শ্রেণীর হাতে প্রথম কিছু কাঁচা টাকা চলে আসে। বেশিরভাগই সেই কাঁচা টাকা ব্যয় করে ফুর্তির পেছনে। রঙিলা বাড়ি ঝলমল করতে থাকে। ঘাটু গান এবং যাত্রা গানের জোয়ার শুরু হয়।

চাষী মুসলমান শ্রেণীর একটা ক্ষুদ্র অংশ কাঁচা টাকা ব্যয় করেন সন্তানদের পড়াশোনার পেছনে। বেশকিছু মুসলমান ছাত্র প্রথমবারের মতো স্কুলে ভর্তি হলো। কোলকাতায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়েল গার্লস স্কুল— যার যাত্রা শুরু হয়েছিল এগারোজন ছাত্রী নিয়ে তার ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে হলো সত্তর। বেশিরভাগই মুসলমান ছাত্রী।

হরিচরণ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছেন। মোটা হলুদ কাগজে টানা লেখা। শেষে নামসই করা— শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিঠিতে লেখা—

শ্রী হরিচরণ সাহা,
প্রীতিভাজনেষু,

বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন— আপনার প্রেরিত অর্থ পাইয়াছি। এই অর্থ গ্রীষ্মের তাপদাহে শীতল জলধারার মতো বোধ হইয়াছে। আপনার কল্যাণ হোক।

ইতি
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন।

হরিচরণ এই চিঠি দীর্ঘসময় কপালে ছুঁইয়ে রাখলেন। তারপরেও মনে হলো চিঠির যথাযোগ্য সম্মান করা হলো না।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি হরিচরণকে আনন্দিত করেছে, একই সঙ্গে অন্য আরেকটি চিঠি তাঁকে মহাবিব্রত করল। সেই চিঠি পত্রবাহক মারফত হাতে হাতে পাঠিয়েছেন মনিশংকর দেওয়ান। সেই চিঠিতে লেখা—

> আমি মহাবিপদে পড়িয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। একমাত্র পুত্র শিবশংকর দুরারোগ্য রোগে মৃত্যুপথযাত্রী। ডাক্তার-কবিরাজ কেহই রোগের কারণ বা প্রতিকারের পথ দিতে পরিতেছে না। আমি সাহেব ডাক্তার দেখাইয়াছি। ইউনানী চিকিৎসাও করিয়াছি। আমার পুত্রের যন্ত্রণা সীমাহীন। পিতা হিসেবে এই যন্ত্রণা দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকমুখে শুনতে পাই আপনি ঈশ্বরের আশীর্বাদে রোগহরণ করিতে পারেন। শেষ চেষ্টা হিসেবে আপনার দ্বারস্থ হইলাম। আমি পুত্রকে নিয়া যে-কোনো সময় বান্ধবপুরে উপস্থিত হইব। আপনি যথাসাধ্য করিবেন ইহাই আমার প্রার্থনা। যাত্রার শুভদিন নির্ণয়ের জন্যে পঞ্জিকা দেখিতেছি। বুধবার বারবেলা শুভদিন পড়িয়াছে। ঐ দিন রওনা হইবার সম্ভাবনা আছে। বুধবার রওনা হইলে শুক্রবার নাগাদ পৌঁছিবার কথা। বাকি ঈশ্বরের ইচ্ছা।

মনিশংকর তাঁর পুত্রকে বান্ধবপুরে নিয়ে এসেছেন। তাঁর দোতলা বাড়ির বারান্দায় খাটের উপর পাটি পেতে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। ছেলের পায়ের কাছে মনিশংকর মাথা নিচু করে বসে আছেন। ছেলের যন্ত্রণা তিনি সহ্য করতে পারছেন না, আবার উঠে চলেও যেতে পারছেন না। ছেলের মা ঠাকুরঘরে ঢুকেছেন। সেখানে পূজা চলছে। পূজার জন্যে দু'জন ব্রাহ্মণ এসেছেন কোলকাতা থেকে।

উঠানে নাম সংকীর্তন হচ্ছে। অনেক লোকজন ভিড় করেছে। দুর্গাপূজার মতো জমজমাট অবস্থা। গভীর বিষাদেও এক ধরনের উৎসবের ছোঁয়া থাকে।

শিবশংকরের বয়স মাত্র নয়। তীব্র ব্যথা সে নিতে পারছে না। ব্যথার একেকটা ধাক্কা আসে, ছেলে বাবার দিকে তাকিয়ে বলে— বাবা, ব্যথা কমায়া দাও। বাবা, ব্যথা কমায়া দাও। অসহায় বাবা হাউমাউ করে কেঁদে উঠেন।

খবর পেয়ে হরিচরণ এসেছেন। তাঁকে দেখে মনিশংকর ফুঁপিয়ে উঠে বললেন, আমাকে বিষ এনে দেন। আমি বিষ খেয়ে মরে যাই। ছেলের যন্ত্রণা নিতে পারছি না।

হরিচরণ খাটের পাশে এসে দাঁড়ালেন। শিবশংকর বলল, হরিকাকু, ব্যথা! ব্যথা!

হরিচরণ বললেন, বাবা, কোথায় ব্যথা ?

শিবশংকর তার পেটের দিকে ইশারা করল। হরিচরণ হাঁটু গেড়ে ছেলের পাশে বসলেন। তার পেটে হাত রেখে চোখ বন্ধ করলেন। মনে মনে ডাকলেন, হে পরম পিতা। হে দয়াময়। তোমার সৃষ্ট এই ক্ষুদ্রপ্রাণের প্রতি তুমি দয়া কর।

হরিচরণ অতি দ্রুত প্রার্থনার গভীরে পৌঁছে গেলেন। তিনি কোথায় আছেন, কী করছেন কিছুই তাঁর মনে রইল না। তাঁর শুধুই মনে হলো, তিনি কোনো এক অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন। গৃহ মন্দিরের পূজার ঘণ্টার শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসছে। লোকজনের চলাচল, কথাবার্তার কোনো শব্দই তাঁর কানে আসছে না। তিনি গভীর বিশ্বাস থেকে বলে যাচ্ছেন— দয়া কর দয়াময়। দয়া কর। দয়া কর।

হরিচরণের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। একসময় হঠাৎ তাঁর কাছে মনে হলো, তিনি সাঁতরাতে শুরু করেছেন। কূল কিনারা নেই এমন কোনো দিঘি। যার জল স্বচ্ছ ও শীতল। একটি শিশু ডুবে যাচ্ছে। তাকে ধরতে হবে। এই তাকে আবছা দেখা যাচ্ছে, এই দেখা যাচ্ছে না। অনেক দিন আগে এরকম ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর শরীর অবসন্ন। তিনি দম পাচ্ছেন না। জলের শীতলতায় তাঁর শরীর জমে যাচ্ছে। তিনি হাত-পা নাড়তে পারছেন না।

উঠান থেকে অনেকটা দূরে বাবলা গাছের নিচে শশী মাস্টার এবং মফিজ দাঁড়িয়ে। দু'জনের দৃষ্টি হরিচরণের দিকে। দোতলার রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে হরিচরণের মুখ দেখা যাচ্ছে। হরিচরণ সামান্য দুলছেন। শশী মাস্টার বললেন, দৃশ্যটার মধ্যে অলৌকিক কিছু আছে। যদিও আমি জানি অলৌকিকত্ব বলে কিছু নেই। প্রার্থনায় কিছু হয় না। প্রার্থনায় কিছু হলে পৃথিবীর মানুষ সব ফেলে প্রার্থনাই করে যেত।

মফিজ বললেন, প্রার্থনায় কিছু হয় না, তারপরেও আমরা কিন্তু প্রতিনিয়তই প্রার্থনা করি।

শশী মাস্টার বললেন, হরিবাবুর এই প্রার্থনা কতক্ষণ চলবে বলে তোর মনে হয় ?

মফিজ বললেন, বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা উনি Trance State-এ চলে গেছেন। Trance ভাঙতে সময় লাগবে।

শশী মাস্টার বললেন, যতক্ষণই লাগুক আমি অপেক্ষা করব।

হরিচরণ এসেছিলেন দুপুরের আগে আগে— সন্ধ্যা হয়ে গেল। মনিশংকরের বাড়িতে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালানো হলো। পূজার ঘণ্টা এবং শাঁখ বাজতে লাগল। হরিচরণ ছেলের গা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। শিবশংকর বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা জল খাব।

মনিশংকর কাঁসার গ্লাসে করে পানি নিয়ে এলেন। চামচ আনলেন, চামচে করে খাওয়ানোর জন্যে। শিবশংকর বলল, বাবা আমাকে উঠারে বসাও, আমি হাত দিয়ে গ্লাস ধরে চুমুক দিয়ে জল খাব। আমার ব্যথা নাই।

মনিশংকর হতভম্ব গলায় বললেন, ব্যথা নাই ? সত্যি ব্যথা নাই ?

ছেলে না-সূচক মাথা নাড়ল।

মনিশংকর এই আনন্দ নিতে পারলেন না, অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। [মনিশংকরের পুত্র শিবশংকর পরিণত বয়সে যক্ষায় মারা যান। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার এবং পরে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার।]

হরিচরণ বারান্দার বেতের চেয়ারে শুয়ে আছেন। তিনি ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত। তাঁর চোখ বন্ধ। তিনি বড় বড় করে নিঃশ্বাস ফেলছেন। কিছুক্ষণ আগেও তীব্র মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল, এখন নেই। রাত অনেক হয়েছে। দ্বিতীয় প্রহরের শেয়াল ডাকাডাকি শুরু করেছে। হরিচরণের সামনে কাঠের চেয়ারে কাঁসার জগভর্তি পানি এবং গ্লাস। তিনি কিছুক্ষণ পরপরই পানির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। তাঁর পেছনে শশী মাস্টার বসে আছেন। মফিজ আছেন মনিশংকরের বাড়িতে।

শশী মাস্টার বললেন, এখন কি একটু ভালো বোধ করছেন ?

হরিচরণ বললেন, না।

মাথার যন্ত্রণা কমে নাই ?

মাথার যন্ত্রণা কমেছে, বুকে চাপ ব্যথা।

পালংকে শুয়ে থাকবেন ?

না।

শশী মাস্টার বললেন, যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনার সঙ্গে রাতটা কাটাই।

হরিচরণ বললেন, আমি বারান্দাতেই বসে থাকব।

শশী মাস্টার বললেন, আমিও থাকব। অলৌকিক কোনো কিছুতে আমার বিশ্বাস নাই, কিন্তু আজকের ঘটনাটা নিতে পারছি না।

হরিচরণ বললেন, আমিও না। তবে প্রবল ঘোরের মধ্যে আমার বিশেষ এক ধরনের উপলব্ধি হয়েছে। হয়তো পুরোটাই ভ্রান্তি, মনের ভুল। জগৎ, সৃষ্টি রহস্য, পরকাল— এইসব নিয়ে খুব চিন্তা করি বলেই হয়তো দেখেছি।

কী দেখেছেন ?

আজ থাক। আরেকদিন বলব।

আচ্ছা।

অভিজ্ঞতা বলে বোঝাতে পারব সেরকমও মনে হচ্ছে না। পুরো ব্যাপারটা অস্পষ্ট।

অস্পষ্ট ?

হরিচরণ বললেন, অস্পষ্ট বলাটাও ঠিক না, খুব স্পষ্ট; তবে সেই স্পষ্টতার ধরন ভিন্ন।

কথাটা বুঝতে পারলাম না।

হরিচরণ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আমার কাছে হঠাৎ মাকড়সার জালের মতো মনে হলো। কেউ আলাদা না, সবাই যুক্ত এবং প্রত্যেকেরই প্রাণ আছে। ইট, কাঠ, বালুকণা— সবই জীবন্ত। আরেকটা উপলব্ধি হয়েছে...

আপনি ক্লান্ত। বিশ্রাম করুন। আরেকদিন শুনব। তবে আজ না বললে আপনি আর কোনোদিন বলতে পারবেন না।

হরিচরণ বললেন, কেন বলতে পারব না ?

শশী মাস্টার বললেন, আমি যতদূর অনুমান করছি আপনার অভিজ্ঞতা স্বপ্নের মতো। স্বপ্নের স্মৃতি অতি অল্প সময়ের স্মৃতি। আপনি ভুলে যাবেন।

হরিচরণ গ্লাসে পানি ঢেলে চুমুক দিলেন। চেয়ারে শরীর এলিয়ে চোখ বন্ধ করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি একটা সুখ স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নের মধ্যেও তিনি একই জায়গায় ঘুমুচ্ছেন, শিউলির মা রাণীবালা এসে তাঁর ঘুম ভাঙালেন। তিনি উঠে বসতে বসতে বললেন, বউ কোনো সমস্যা ?

রাণীবালা বললেন, আপনার কন্যার বিবাহ, আর আপনি এখানে শুয়ে আছেন!

শিউলির বিবাহ ?

হুঁ। কিছুক্ষণের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান হবে। নিন গরদের চাদরটা গায়ে দিন।

তিনি অতি ব্যস্ত ভঙ্গিতে চাদর গায়ে দিতেই দৃশ্য বদলে গেল। তিনি দেখলেন বিয়ের আসরে পুরুতের পাশে তিনি দাঁড়িয়ে। তাঁর সামনেই তাঁর বাবা প্রিয়নাথ। হরিচরণ বিস্মিত হয়ে বললেন, বাবা তুমি এসেছ!

প্রিয়নাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি আসব না কীভাবে ভাবলি ? তুই ছোটবেলায় যেরকম গর্ধব ছিলি এখনো তো গর্ধবই আছিস। উন্নতি কিছুই তো হয় নাই।

বাবা, মা কি এসেছে ?

তাকে ছাড়া আমি আসব এটা ভাবলি কীভাবে ? সবাইকে নিয়ে এসেছি। কেউ বাদ নাই। শুধু আমার মেজদা আসেন নি।

উনি আসেন নি কেন ?

মেজদা সন্ন্যাস নিয়ে কোথায় যে চলে গেল। অনেক সন্ধান করেও খোঁজ পাই নি।

হরিচরণ অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকালেন। বাড়ি গমগম করছে। মৃত-জীবিত সবাই উপস্থিত। প্রিয়নাথ ধমক দিলেন, হা করে দেখছিস কী ? সবাইকে প্রণাম কর। কেউ যেন বাদ না থাকে। নারায়ণ। নারায়ণ।

হরিচরণের স্বপ্নভঙ্গ হলো 'নারায়ণ নারায়ণ' শব্দে। খাটে শুয়ে আছেন। ঘুমের মধ্যেই কেউ তাঁকে ধরাধরি করে খাটে শুইয়ে দিয়েছে।

এশার নামাজ শেষ করে মাওলানা ইদরিস মনিশংকর বাবুর ছেলের খোঁজ নিতে গেলেন।

ছেলে ভালো আছে। আরাম করে ঘুমাচ্ছে। সারাদিন কিছু খায় নি। ঘুমানোর আগে এক বাটি দুধ খেয়েছে। মাওলানা বললেন, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

মনিশংকর এখনো স্বাভাবিক হতে পারেন নি। কিছুক্ষণ পর পর ছটফট করে উঠেন, এদিক ওদিক তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, আমি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দিন এক পুণ্য করেছিলাম। সেই মহাপুণ্যটা কী ? তোমরা কেউ আমাকে বলবে কী সেই মহাপুণ্য ?

মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই এসেছেন। তারা উঠোনের এক কোনায় গোল হয়ে বসা। তাদের মধ্যমণি সুলেমান, এক সন্ধ্যায় সে হরিচরণের বাড়ির দিঘির ঘাটে কী দেখেছিল সেই গল্প নিচু গলায় বলছে। চোখ বড় বড় করে সবাই শুনছে। শ্রোতাদের মধ্যে কাউকেই শূন্যে ভাসার বিষয়টির অস্বাভাবিকতা স্পর্শ করছে না। মোহাম্মদ মফিজ বললেন, আপনি নিজে দেখেছেন ?

সুলেমান বলল, অবশ্যই। আমি যদি মিথ্যা বলি আমার মাথায় যেন ঠাডা পড়ে। মাওলানা সাবও তাঁর বিষয়ে একটা জিনিস দেখছেন, তারে জিজ্ঞাস করতে পারেন। মাওলানা, ঘটনাটা বলেন।

মাওলানা আসর ছেড়ে উঠে পড়লেন। তাঁর প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে। বাড়িতে যাবেন, রান্না করবেন তারপর খাওয়া। ইদানীং রাতের খাওয়া তাঁকে কষ্ট দিচ্ছে। প্রায়ই মনে হচ্ছে, কেউ একজন যদি থাকত যে রান্না করে রাখবে। এবাদত বন্দেগি শেষ করে যাকে নিয়ে তিনি খেতে বসবেন। খেতে খেতে সুখ-দুঃখের কিছু গল্প। সবার ভাগ্যে সব কিছু হয় না। ভাগ্যকে দোষ দেওয়াও ঠিক না, কারণ আল্লাহপাক স্বয়ং বলেছেন, 'ভাগ্যকে দোষ দিও না, কারণ আমিই ভাগ্য।'

মাওলানা রান্না চড়িয়েছেন। চাল ডালের খিচুড়ি। ঘরে ঝিংগা ছিল, কুচি কুচি করে ঝিংগা দিয়েছেন। খুঁজে পেতে দু'টি আলু পাওয়া গেল। আলু দু'টি

দিয়ে দিলেন। খিচুড়ি নামাবার আগে আগে এক চামচ ঘি দিয়ে দেবেন। ঘিয়ের সুঘ্রাণে সমস্ত ত্রুটি ঢাকা পড়ে যাবে।

মাওলানা, বাড়িতে আছেন ?

মাওলানা ঘর থেকে বের হয়ে দেখেন, মোহাম্মদ মফিজ।

আপনার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি।

মাওলানা আনন্দিত গলায় বললেন, অবশ্যই অবশ্যই।

কী করছিলেন ?

রান্না বসায়েছি জনাব। আসেন রান্নাঘরে চলে আসেন। বাড়িতে কোনো স্ত্রীলোক নাই। পর্দা করার কেউ নাই।

কী রান্না করছেন ?

সামান্য খিচুড়ি। দুই ভাই মিলে খেয়ে ফেলব।

দুই ভাইটা কে ?

মাওলানা বললেন, আমি আর আপনি। জনাবের নিশ্চয়ই খাওয়া হয় নাই ?

জি-না। আপনার সঙ্গে অতি আগ্রহের সঙ্গে খাব।

মাওলানা বললেন, আল্লাপাক আপনার আজ রাতের রিজিক আমার হাঁড়িতে দিয়েছেন। উনার অশেষ মেহেরবানি।

মোহাম্মদ মফিজ বললেন, আপনার মতো খোদাভক্ত মানুষ খুব বেশি আছে বলে আমি মনে করি না। এই ধরনের ভক্তি দেখাতেও আনন্দ।

দু'জন রান্নাঘরে বসেছেন। মাওলানা আরেক মুঠ চাল হাঁড়িতে দিয়ে দিয়েছেন। মাওলানা রান্নার প্রক্রিয়ায়ও একটা পরিবর্তন করেছেন। খিচুড়ি ডালের মতো বাগাড় দেবেন বলে ঠিক করেছেন। সিদ্ধ হয়ে গেলে অন্য একটা হাঁড়িতে ঘি'র সঙ্গে পেঁয়াজ ভোজ বাগাড়। অতিথির কারণে উন্নত ব্যবস্থা।

মাওলানা সাহেব!

জি জনাব ?

সুলেমান নামের লোকটা বলছিল, আপনি হরিবাবুর একটা বিশেষ জিনিস জানেন, সেটা কী ?

উনি সাধু প্রকৃতির মানুষ। উচ্চশ্রেণীর সাধু। এর বেশি কিছু জানি না।

সুলেমান যে বলল, আপনি বিশেষ কিছু জানেন।

গ্রামের মানুষ অন্যকে সাক্ষী মেনে কথা বলতে পছন্দ করে। তাদের অনেক দোষের মধ্যে এটা বড় দোষ।

আজ যে ঘটনা ঘটল এই বিষয়ে আপনার মতামত কী ?

মাওলানা বললেন, আল্লাহপাক মনিশংকর বাবুর পুত্রকে দয়া করেছেন। উনি যখন যাকে ইচ্ছা দয়া করেন।

হরিচরণ বাবুর এখানে কোনো ভূমিকা নাই ?

আছে। আল্লাহপাক উনার মাধ্যমে দয়া করেছেন। উনার মাধ্যমে দয়া করেছেন বলে উনাকেও দয়া করা হয়েছে। আমাদের ঈসা নবির কথা মনে করেন, উনি অন্ধকে দৃষ্টি দিতেন, কুষ্ঠরোগী ভালো করতেন।

হরিচরণ বাবু নিশ্চয়ই ঈসা নবি না।

অবশ্যই না। আমরা কেউ কারো মতো না। সবাই আলাদা।

মোহাম্মদ মফিজ বললেন, আল্লাহপাকের কাছেও কি প্রতিটি মানুষ আলাদা, না-কি তাঁর কাছে সবাই এক ?

মাওলানা ইদরিস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, অতি জটিল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জবাব দিবার মতো জ্ঞান আমার নাই। তবে কথাটা আমার মনে থাকবে। যদি কখনো কোনো প্রকৃত জ্ঞানী মানুষের সন্ধান পাই তাকে জিজ্ঞেস করব। খানা তৈয়ার হয়েছে, আসেন খানা খাই।

খাওয়া শেষ করে মোহাম্মদ মফিজ বললেন, আমি আমার এক জীবনে অনেক ভালো ভালো খাবার খেয়েছি— এত ভালো খাবার খাই নি। যত দিন বেঁচে থাকব আপনার হাতের রান্না মনে থাকবে।

মাওলানা বললেন, সবই আল্লাহপাকের খেলা, তিনি আমাদের মুখে রুচি দিয়েছেন। উনার দরবারে শুকরিয়া। আসেন দুই ভাই মিলে আল্লাহপাকের দরবারে মোনাজাত করি।

মোহাম্মদ মফিজ বললেন, কিছু মনে করবেন না। এই দোয়াটা আপনি একা করুন। আমি পাশে বসে দেখি।

হরিচরণ পারুল গাছের নিচে বসে আছেন। তাঁর শরীর দুর্বল। রোজ রাতে নিয়ম করে জ্বর আসছে। সকালে জ্বর সেরে যায় কিন্তু তার থাবা রেখে যায়। সারাটা দিন কাটে ক্লান্তিতে এবং রাতে জ্বর আসবে তার প্রতীক্ষায়।

কড়া রোদ উঠেছে। হরিচরণের গায়ে রোদ চিড়বিড় করছে। একটু সরে বসলেই রোদের হাত থেকে বাঁচা যায়। সরে বসতেও ইচ্ছা করছে না। হরিচরণের চোখ বন্ধ। তাঁর ঝিমুনির মতো এসেছে। কে যেন তাঁর পায়ে হাত

দিল। হরিচরণ চমকে উঠে চোখ খুললেন। কিশোরী এক মেয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। শাড়ি পরায় তাকে বড় বড় দেখাচ্ছে। মেয়েটার মুখে অস্বাভাবিক মায়া। হরিচরণ বললেন, এই তুই কে ?

আমার নাম যমুনা।

তুই করিরাজ সতীশ বাবুর মেয়ে না ?

হুঁ।

এতবড় হয়ে গেলি কবে ?

যমুনা খিলখিল করে হাসল। হরিচরণ বললেন, তুই যে আমার পায়ে হাত দিলি তোর তো জাত গেছে।

যমুনা বলল, কেউ দেখে নাই।

হরিচরণ বললেন, তাও ঠিক। জাত যাবার জন্যে কাউকে না কাউকে দেখতে হবে। তুই এত দূরে একা এসেছিস ?

যমুনা বলল, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আসছি।

বলিস কী! কী জন্যে ?

যমুনা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, বলতে লজ্জা করে।

হরিচরণ হাসতে হাসতে বললেন, চোখ বন্ধ করে বল। চোখ বন্ধ করে বললে লজ্জা লাগবে না।

যমুনা চোখ বন্ধ করল না, অন্যদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনি আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করবেন।

কী আশীর্বাদ ?

আমার যেন বিবাহ হয়।

বিবাহ তো এমনি হবে। এর জন্যে আশীর্বাদ লাগবে কেন ?

যমুনা জবাব দিল না, গা মোড়ামুড়ি করতে লাগল। লজ্জায় তার গালে লালচে আভা দেখা দিল। হরিচরণ বললেন, বিশেষ কারো সঙ্গে বিবাহ ?

হুঁ।

নাম কী ?

সুরেন। কলিকাতায় থাকে। কলেজে পড়ে।

তোর ধারণা আমি আশীর্বাদ করলেই সুরেনের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে ?

হুঁ।

হরিচরণ হাসতে হাসতে বললেন, কাছে আয়, আশীর্বাদ করে দিচ্ছি।

যমুনা তাঁর সামনে মাথা নিচু করল। হরিচরণ উচ্চস্বরে প্রার্থনা করলেন, হে ভগবান! হে পরমপিতা! তোমার এই সন্তানটির অন্তরের গোপন বাসনা তুমি পূর্ণ কর। সুরেনের সঙ্গে তোমার এই সন্তানের শুভবিবাহ যেন হয়। সেই বিবাহ যেন মঙ্গলময় হয়। তুমি তোমার এই অবোধ সন্তানকে দয়া কর।

যমুনা প্রার্থনা শুনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। হরিচরণের হঠাৎ মনে হলো যমুনা কাঁদছে না। কাঁদছে তাঁর কন্যা শিউলি। এই ধরনের ভ্রান্তি আজকাল তাঁর ঘন ঘন হচ্ছে।

ন্যায়রত্ন রামনিধি কাশির এক পণ্ডিত নিয়ে এসেছেন। পণ্ডিতের নাম নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তর্কালঙ্কার। তাঁরা সরাসরি হরিচরণের বাড়িতে এসেছেন। হরিচরণ অতি সমাদরে তাদেরকে বসিয়েছেন। তাদের আগমনের হেতু বিচিত্র। হরিচরণ পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। এখন তিনি আর জাতিচ্যুত না। তার বাড়িতে অতি উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরাও জল গ্রহণ করতে পারবেন। বিধান এসেছে সরাসরি কাশি থেকে।

রামনিধি বললেন, তোমার বাড়িতে ফলাহার করতেও এখন আর আমাদের আপত্তি নাই। এই মীমাংসা করতে অনেক পরিশ্রম হয়েছে। কয়েকবার কাশি যেতে হয়েছে। তুমি ইচ্ছা করলে এই খরচ দিতে পার, না দিলেও ক্ষতি নাই।

হরিচরণ বললেন, এত ঝামেলা করেছেন কী জন্যে ?

তোমার দিকে তাকিয়ে করেছি। তুমি বিশিষ্টজন। ভালো কথা, উড়া উড়া অনেক কথা তোমার বিষয়ে শুনি। তুমি শরীরে হাত দিলে নাকি রোগ সারে ?

হরিচরণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন, কিছু বললেন না। রামনিধি গলা নামিয়ে বললেন, দীর্ঘ দিন শূল বেদনায় কষ্ট পাচ্ছি। দেখ কিছু করতে পার কিনা। তুমি হাত দিলেই কাজ হয়, না-কি মন্ত্র পাঠ করতে হয় ? কী মন্ত্র পড় ? নগেন বাবুর বাম হাঁটুতেও বিরাট সমস্যা। হাঁটতে পারেন না বললেই হয়। তাঁর বিষয়েও কিছু করা যায় কি-না দেখ।

হরিচরণ বললেন, আমি শরীরে হাত দিলে রোগ সারে না। আমি কোনো অবধূত না। আমি সাধারণ মানুষ। আপনার শরীরে হাত রাখতে আমার কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু আপনি ভেবে দেখেন হাত রাখা ঠিক হবে কি-না ? আমার এই বাড়িতে একজন মুসলমান শিক্ষক থাকেন। তাঁর নাম মোহাম্মদ মফিজ।

রামনিধি এবং তর্কালঙ্কার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। হরিচরণ বললেন, তারচেয়েও বড় সমস্যা, এক ডোমের মেয়ে আমাকে বাবা ডাকে। সে মাঝে মাঝে এসে ঘরদুয়ার পরিষ্কার করে।

রামনিধি বললেন, সর্বনাশ! আগে বলবা না! তুমি দেখি আমাদের নরকবাসী করার বুদ্ধি করেছ। রাম রাম।

হরিচরণ বললেন, ডোম কন্যাদের সঙ্গে যৌন কর্মে বর্ণহিন্দুর সমস্যা নাই। এতে তাদের জাত যায় না, কিন্তু এরা বর্ণহিন্দুর বাড়িতে এসে ঘর ঝাট দিলে জাত যায়— এটা কেমন কথা ?

তোমার সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনার জন্যে আমি আসি নাই। শাস্ত্র বোঝার মতো জ্ঞান বুদ্ধি তোমার হয় নাই। আমরা উঠলাম। আজকাল হাড়ি ডোম মেথর নিয়া আছ আমাদের জানা ছিল না।

দুই শাস্ত্র পণ্ডিত হরিচরণের বাড়ি থেকে বের হয়েই গঙ্গাজলে স্নান করে পবিত্র হলেন। বোতলভর্তি গঙ্গাজল তাদের সঙ্গেই ছিল। এই জলের কয়েক ফোঁটা স্নানের পানিতে মিশিয়ে নিলেই গঙ্গা স্নান হয়।

শশী মাস্টার চলে যাবেন, তার ডাক এসেছে। তাকে যেতে হবে চট্টগ্রামে। সূর্যসেন নামের একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। যাকে সবাই চেনেন 'মাস্টারদা' নামে। হরিচরণকে বললন, মা'র শরীর ভালো না। উনি আমাকে ক্ষমা করে কাছে ডেকেছেন। হরিচরণ বললেন, অতীব আনন্দ সংবাদ। রওনা হবার আগে আগে শশী মাস্টার হরিচরণের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। হরিচরণ আঁতকে উঠে বললেন, কর কী, কর কী, তুমি ব্রাহ্মণ!

শশী মাস্টার বললেন, আপনার চেয়ে বড় ব্রাহ্মণ তো আপাতত চোখে পড়ছে না।

তোমার পিতা-মাতাকে আমার প্রণাম দিও। তুমি কি এখনই রওনা দিচ্ছ ?

শশী মাস্টার বললেন, আমি রাতে যাব। সন্ধ্যাবেলায় এক জায়গায় যাব। একজনের সঙ্গে দেখা করব। তাকে একটা জিনিস দেব। তার নাম যদি জানতে চান বলতে পরি।

হরিচরণ বললেন, নাম বলার প্রয়োজন নাই।

জুলেখার কাছ থেকে শশী মাস্টার বিদায় নিয়েছেন। কলের গান জুলেখাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কীভাবে দম দিতে হয় কীভাবে পিন বদলাতে হয় শিখিয়ে দিয়েছেন।

হাসিমুখে বলেছেন, জুলেখা যাই ?

জুলেখা বলল, একটু বসেন। শরবত দেই। শরবত খান।

শশী মাস্টার বসতে বসতে বললেন, বসতে যখন বলছ বসে যাই। তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ।

জুলেখা বলল, রাতটা থাকেন, আরাম করে ঘুমান। আমি সারারাত আপনার পায়ে হাত বুলায়ে দিব।

সেবা নেওয়ার অভ্যাস নাই জুলেখা।

জুলেখা বলল, মানুষ মানুষের সেবা নেয়। পশু পশুর সেবা নিতে পারে না।

সেবার প্রয়োজন নাই। একটা গান শোনাও। তুমি কি রবিবাবুর কোনো গান কখনো শুনেছ ?

না।

উনার গান সম্পূর্ণ অন্য ধারার। শুনলে তোমার ভালো লাগত। আমার গলায় সুর নাই। তারপরেও শোন—

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না ?
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না ?
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে
হারাই-হারাই সদা হয় ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে ॥

জুলেখা বলল, আপনাকে একটা অদ্ভুত কথা বলব। কথাটা শোনার পর আপনি আমাকে খুব খারাপ ভাববেন। তারপরেও বলব।

বলো।

আমার মনে হয় আমার অনেক ভাগ্য যে রঙিলা বাড়িতে আমার স্থান হয়েছে।

বলো কী ?

জুলেখা চাপা গলায় বলল, এইখানে আছি বইলাই আপনার মতো মানুষের সাথে পরিচয় হইছে। গান আমার অন্তরের জিনিস। গান গাইতে পারতেছি। শিখতেছি।

শশী মাস্টার বললেন, অতি কুৎসিত জীবনের বিনিময়ে যেটা পাচ্ছ সেটা কি অতি তুচ্ছ না ?

জুলেখা বলল, আমার কাছে না।

শশী মাস্টার বললেন, তুচ্ছ না তাহলে কাঁদছ কেন ?

জুলেখা বলল, আপনারে আর দেখব না এই দুঃখে কাঁদতেছি। রবিবাবুর আরেকটা গান করেন, আমি গলায় তুলব।

শশী মাস্টার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে গান ধরলেন—

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে—
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে ॥
স্খলিত শিথিল কামনার ভার বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর—
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার, ফেলো না আমারে ছড়ায়ে ॥
চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা বাঁচাও তাহারে মারিয়া।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী তোমারি কাছেতে হারিয়া।

শশী মাস্টার মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় পুলিশের গুলিতে মারা যান। তারিখ ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ সাল। অসীম সাহসী মাস্টারদা সূর্যসেনের কারণে ৪৮ ঘণ্টা চট্টগ্রাম শহর ছিল স্বাধীন শহর। ব্রিটিশ শাসনের আওতার বাইরের এক নগরী।

মাস্টারদা ধরা পড়েন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের তিন বছর পরে। তাঁরই জ্ঞাতি ভাই নেত্র সেন তাঁকে ধরিয়ে দেন। চট্টগ্রাম জেলে বাংলার বীর সন্তান সূর্যসেনকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়।

চৈত্র মাসের শেষ দিকের কথা। কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা মিলিয়েছে। হরিচরণের শরীর খারাপ করেছে। তাঁর প্রবল শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। শরীর খারাপের কারণ আধিভৌতিক। সন্ধ্যাবেলায় তিনি ঘাটে বসেছিলেন। আকাশে ঘন মেঘ থাকায় আগেভাগে অন্ধকার নেমেছে। দিঘির ডানপাশে জোনাকি পোকার বড় একটা ঝাঁক বের হয়েছে। এরা দলবেঁধে পশ্চিম দিকে এগুচ্ছে। হরিচরণ গভীর আগ্রহে এদের গতি-প্রকৃতি লক্ষ করছেন। দিঘির পাড় থেকে বের হয়ে এরা লেবুতলায় কিছুক্ষণ স্থির হলো। সেখান থেকে উড়তে উড়তে বেত ঝোপের পাশে কিছুক্ষণের জন্যে অদৃশ্য হয়ে আবার দেখা দিল। এখন এরা যাচ্ছে শিউলি গাছের দিকে।

হরিচরণ তাকালেন শিউলি গাছের দিকে। হঠাৎ তাঁর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তিনি স্পষ্ট দেখলেন— শিউলি গাছের নিচে ফ্রক পরা এক মেয়ে। মেয়েটার দৃষ্টি তাঁর দিকে। সে হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই তাকিয়ে আছে। তার দিকে দৃষ্টি পড়ার পর সে গাছের আড়ালে চলে গেল। অতি দ্রুত যে গেল তাও না। ধীরে পা ফেলে গেল, তবে সে তার দৃষ্টি একবারের জন্যেও ফিরিয়ে নিল না। হরিচরণের মেয়েটাকে চিনতে কোনো সমস্যা হলো না। মেয়েটা শিউলি। ঢেউ খেলানো চুল, রোগা শরীর, লম্বাটে মুখ।

হরিচরণ চাপা গলায় ডাকলেন, কে! কে গো!

গাছের আড়াল থেকে কেউ উত্তর দিল না। তবে হরিচরণ কিশোরীর পাতলা হাসির শব্দ শুনলেন। এটা কি কোনো বিভ্রান্তি ? কোনো মায়া ? তিনি যদি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন তাহলে কি মেয়েটা আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবে ? হরিচরণ পুকুরের দিকে তাকালেন। মনে মনে বললেন—

যা দেবীষু ভ্রান্তরূপেনু সংস্থিতা
দেবী ভ্রান্তিরূপে অবস্থান করেন।

তিনি আবার তাকালেন শিউলি গাছের দিকে। হ্যাঁ, মেয়েটাকে আবার দেখা যাচ্ছে। সে এখন গাছে হেলান দিয়ে আছে। মেয়েটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই

তো তার রোগা রোগা ফর্সা পা। হরিচরণ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে চাপা গলায় ডাকলেন— মা শিউলি!

মেয়েটি এবার হাত ইশারায় তাঁকে কাছে ডাকল। হরিচরণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি চোখে পলকও ফেলছেন না। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে, পলক ফেললেই এই ছায়াময়ীকে আর দেখা যাবে না।

জঙ্গল আলো করে বিদ্যুৎ চমকালো। মেয়েটাকে আর দেখা গেল না।

হরিচরণ নিজের ঘরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার কাছে হারিকেন জ্বলছে। বাঁ-দিকের জানালা খোলা। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাট আসছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। হরিচরণ মাঝে মাঝে সামান্য কাঁপছেন। তিনি বুকের ব্যথা নিয়ে শুয়েছিলেন। সেই ব্যথা বাড়ছে। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

হারিকেন হাতে মফিজ ঢুকলেন। চিন্তিত গলায় বললেন, আপনার শরীর কি খারাপ করেছে ?

হরিচরণ বললেন, একটা কাগজ-কলম নিয়ে আমার পাশে বসো ? কিছু কাজ আছে।

আপনার কি শরীরটা খারাপ করেছে ?

হুঁ।

ডাক্তার খবর দেই ?

ডাক্তার কবিরাজ পরে খবর দিবে। আগে কাগজ-কলম নিয়ে বসো।

মফিজ কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন। হরিচরণ বললেন, আমার ধারণা আমি বাঁচব না। আমি আমার বিষয়সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করব। সাক্ষী হিসেবে থাকবে তুমি এবং মাওলানা ইদরিস।

মফিজ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, আমার পক্ষে সাক্ষী হওয়া সম্ভব না।

সম্ভব না কেন ?

আমার নাম মফিজ না। আমার নাম জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়।

হরিচরণ বিছানা থেকে উঠে বসলেন। তাকালেন তীক্ষ্ণচোখে। জীবনলাল বললেন, আমি আপনার আশ্রয়ে আত্মগোপন করে আছি।

বিপ্লবী ?

জীবনলাল হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

হরিচরণ বললেন, আমি কিছুটা আন্দাজ করেছিলাম। যাই হোক, আমি আমার সমুদয় বিষয়সম্পত্তি একজনকে দান করতে চাই— তার নাম জহির। সে মুসলমান ছেলে। তার বিষয়ে একটি বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছিলাম বলে এই সিদ্ধান্ত।

জীবনলাল বললেন, স্বপ্নের মতো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক না।

হরিচরণ কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, স্বপ্ন তুচ্ছ না। এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে তর্কে যাব না। যা লিখতে বলেছি লেখ। কাগজ-কলম নিয়ে বসো। আমার শরীর এখন ভালো। এই ভালো থাকবে না। শরীর স্পর্শ করে অনেকের রোগ সারিয়েছি। নিজেরটা পারব না।

জীবনলাল বললেন, সাধারণ কাগজে লেখা দানপত্র টিকবে না। আপনার ঘরে কি স্ট্যাম্প আছে ? আপনি এত বড় ব্যবসায়ী। জমিদারিও আছে। কোম্পানির স্ট্যাম্প তো থাকার কথা।

হরিচরণ বললেন, বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছ। স্ট্যাম্প আছে। বড় ঘরের সিন্দুকে স্ট্যাম্প আছে।

সিন্দুকের চাবি কোথায় ?

হরিচরণ বালিশের নিচ থেকে চাবি বের করে দিলেন।

জীবনলাল স্ট্যাম্প এবং কলম নিয়ে পাশে বসলেন। শান্ত গলায় বললেন, ছেলের বাবার নাম কী ? বাবার নাম লাগবে।

বাবার নাম ভুলে গেছি। মায়ের নাম মনে আছে। জুলেখা।

ঠিকানা কী ?

জুলেখা থাকে বেশ্যাপল্লীতে। রঙিলা বেশ্যাপল্লী।

জীবনলাল চমকে তাকালেন। হরিচরণ বললেন, তুমি যা ভাবছ তা-না। জুলেখা আমাকে বাবা ডাকত। আমি তাকে কন্যাসম জ্ঞান করেছি।

দানপত্র লেখা হলো। হরিচরণ দস্তখত করলেন। বুড়ো আঙুলের ছাপ দিলেন। জীবনলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, সাক্ষী হিসেবে তুমি নিজ নামে দস্তখত কর।

জীবনলাল দস্তখত করলেন। হরিচরণ বললেন, দানপত্রে মাওলানা ইদরিসের দস্তখত নিয়ে আস। ভালোকথা, দানপত্র তোমার হেফাজতে রাখবে। ব্যবস্থা নিবে যেন দানপত্র মতো কাজ হয়।

ঠিক আছে।

এখন আমাকে ধরাধরি করে বারান্দায় নিয়ে যাও।

আপনার শরীর খুবই খারাপ, আপনি শুয়ে থাকুন, আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

হরিচরণ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, তোমাকে যা করতে বলছি সেটা কর। তারপর ডাক্তার-কবিরাজ যা আনবার আনবে।

হরিচরণকে বারান্দার ইজিচেয়ারে শুইয়ে জীবনলাল ডাক্তারের সন্ধানে গেলেন। বৃষ্টি নেমেছে জোরেশোরে। বাতাস দিচ্ছে। বাতাসে গাছের পাতা নড়ে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। হরিচরণ চোখ বন্ধ করলেন। উপনিষদের মঙ্গলাচরণ আবৃত্তি করলেন—

ওঁ ভদ্রং কর্নেভি; শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমক্ষ ভির্যজত্রাঃ।
ধ্যাশেম দেবহিতং যদায়ু :
ওঁ শান্তি : শান্তি : শান্তি।

হে দেবগণ, কান দিয়ে যা কিছু ভালো তাই যেন শুনতে পাই। যা কিছু ভালো তাই যেন চোখ দিয়ে দেখতে পাই। আমার জন্যে নির্দিষ্ট যে আয়ু দেবতারা ঠিক করে দিয়েছেন, তা যেন শান্তিময় হয়।

হরিচরণ চোখ খুললেন, অবাক হয়ে দেখলেন, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তাঁর কন্যা শিউলি এগিয়ে আসছে। কী আশ্চর্য, তার পায়ে লাল টুকটুক জুতা। এই জুতাই তো পূজার সময় তিনি এনে দিয়েছিলেন। জুতাজোড়া পায়ে দেবার আগেই তার মৃত্যু হলো। তার মা জুতাজোড়া সিন্দুকে তুলে রেখেছিলেন। আহারে কতদিন আগের কথা। শিউলি এসে হরিচরণের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট গলায় বলল, কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি!!

হরিচরণ দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। শিউলি ঠোঁট টিপে হাসছে এবং পায়ে পায়ে এগুচ্ছে। হরিচরণ অপেক্ষা করছেন কখন তাঁর মেয়ে এসে তাঁর হাত ধরে। হরিচরণ ঢোলের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। ঢোল, করতাল বাজিয়ে নামজপ হচ্ছে। বহু মানুষ একত্রে হরি হরি করছে। সেই শব্দ সমুদ্র গর্জনের মতো।

হরিচরণের বাড়িতে ঢোল, করতাল বাজছে না। নামজপও হচ্ছে না। তবে জহির যে প্রকাণ্ড কেরায়া নৌকায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে সেখানে নামজপ হচ্ছে। নৌকা কোথায় যাচ্ছে সে জানে না। জানার আগ্রহও বোধ করছে না। তার হাতে একটা কানাকড়িও নেই। সকাল থেকে সে কয়েক দফা পানি ছাড়া কিছুই খায় নি। এখন ক্ষিধেয় নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছে। সে গভীর আগ্রহে নৌকার গলুইয়ে বসা এক বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে আছে। বৃদ্ধ কোঁচড়ভর্তি মুড়ি নিয়ে বসেছে। তার হাতে

পাকা মর্তমান কলা। সে এক গাল মুড়ি মুখে দিচ্ছে এবং কলায় কামড় দিচ্ছে। জহিরের মনে হচ্ছে, এরচে' সুন্দর কোনো দৃশ্য সে তার জীবনে দেখে নি।

বৃদ্ধ জহিরের দিকে তাকিয়ে বলল, মুড়ি খাইবা ?

জহির বলল, না।

বৃদ্ধ বলল, না কেন ? মুখ দেইখা বোঝা যায় ভুখ লাগছে।

জহির বলল, আমি মুসলমান।

বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে একটু সরে গিয়ে বলল, সেইটা বলো। সে একটা মর্তমান কলা জহিরের দিকে গড়িয়ে দিয়ে বলল, ফল খাও। ফলে দোষ লাগে না।

কলাটা গড়াতে গড়াতে জহিরের পায়ের কাছে এসে থামল। জহির কলাটার দিকে তাকিয়ে রইল। হাতে নিল না।

বৃদ্ধ বললেন, তোমার নাম কী ?

জহির বলল, আমার নাম লাবুস। মোহাম্মদ লাবুস।

বৃদ্ধ বলল, লাবুস আবার কেমন নাম ?

জহির বলল, খুবই ভালো নাম।

উকিল মুনসির স্ত্রী লাবুসের মা'র মন বিষণ্ন। লাবুস কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হয়েছে। অথচ এই ছেলেটার প্রতি তাঁর মমতার কোনো সীমা ছিল না। লাবুসের মা তাহাজ্জুদের নামাজ শেষ করে দীর্ঘসময় নিয়ে প্রার্থনা করলেন। যেন তাঁর লাবুস ভালো থাকে সুখে থাকে। কোনো একদিন যেন ফিরে আসে তাঁর কাছে।

রাত অনেক। লাবুসের মা খাটে হেলান দিয়ে বসেছেন। উকিল মুনসি বাড়িতে নেই। গানের দল নিয়ে সুনামগঞ্জ গিয়েছেন। কবে ফিরবেন তার ঠিক নেই। লাবুসের মা নিঃসঙ্গ বোধ করছেন। স্বামীর জন্যে খুব খারাপ লাগছে। তিনি ঠিক করলেন, রাতে ঘুমাবেন না। এবাদত বন্দেগি করে রাতটা পার করবেন।

দরজার পাশে খুট করে শব্দ হলো। লাবুসের মা ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হলেন। ফুটফুটে একটা মেয়ে ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে চাপা হাসি। যেন বড়ই আনন্দময় কোনো ঘটনা তার জীবনে ঘটেছে। লাবুসের মা বললেন, তুমি কে গো ? তুমি কোন বাড়ির ?

মেয়েটি বলল, আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছি।

কী খবর ?

আমার বাবা মারা গেছেন।

লাবুসের মা অবাক হয়ে বললেন, তোমার বাবা মারা গেছেন কিন্তু তোমার মনে আনন্দ। ঘটনা কী ? তোমার নাম কী ? তোমার বাবার পরিচয় কী ?

আমার নাম শিউলি। আমার বাবার নাম হরিচরণ। তিনি বান্ধবপুরের ছয় আনির জমিদার। আমি যাই ?

মেয়েটা খুব স্বাভাবিকভাবেই দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। লাবুসের মা মেয়েটার পেছনে পেছনে গেলেন। কাউকে দেখতে পেলেন না।

মাওলানা ইদরিস বিসমিল্লাহ্ বলে দানপত্রে দস্তখত করতে করতে বললেন, জীবনলাল নামের যে সাক্ষী উনাকে তো চিনলাম না। উনি কে ?

জীবনলাল বললেন, আমার নাম জীবনলাল। আমি আপনার কাছে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছি। তার জন্যে ক্ষমা করবেন।

মিথ্যা পরিচয় কেন দিয়েছেন জানতে পারি ?

আমি বিপ্লবী দলের মানুষ। মিথ্যা নাম নিয়ে পালিয়ে আছি। হরিচরণ বাবুও আমার আসল পরিচয় আজ জেনেছেন। আমরা আসল পরিচয় কখনো প্রকাশ করি না।

আমার কাছে তো করেছেন।

জীবনলাল বললেন, আপনার কাছে পরিচয় কেন প্রকাশ করলাম নিজেও বুঝতে পারছি না। দুর্বল মুহূর্তে মানুষ এইসব কাণ্ড করে। অসুস্থ হরিচরণ বাবুকে দেখে মনটা দুর্বল হয়েছে।

মাওলানা ইদরিস ইতস্তত করে বললেন, ইসলাম ধর্ম বিষয়ে আপনি আমাকে অনেক কিছু বলেছেন। সবই আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছি। কথাগুলি কি সত্য ?

যা বলেছি সবই সত্য। একজন বিধর্মীও তো আপনাদের ধর্ম বিষয়ে জানতে পারে। পবিত্র কোরান শরিফ বাংলাভাষায় একজন হিন্দু প্রথম অনুবাদ করেছেন। এটা কি জানেন ?

মাওলানা ইদরিস বিস্মিত হয়ে বললেন, জানি না। আজ প্রথম শুনলাম। উনার নাম কী ?

গিরিশ চন্দ্র সেন। তাঁর এই কাজের জন্যে মুসলমানরা তাঁকে সারাজীবনই যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছে। মুসলমানরা তাঁকে ডাকত ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন।

মুসলমান কখনোই তাঁকে শুধু গিরিশ চন্দ্র ডাকত না। তিনি সবার কাছে ভাই গিরিশ চন্দ্র।

মাওলানার চোখে পানি এসে গেছে। তিনি চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, বড় সুন্দর একটা ঘটনা আপনার কাছে শুনলাম। খুবই আনন্দ পেয়েছি। আনন্দে চোখে পানি এসেছে। আপনাকে শুকরিয়া। এই বাংলা কোরান শরিফ কীভাবে সংগ্রহ করা যায় একটু বলবেন ?

আমি ব্যবস্থা করে দিব। উঠি ? আসসালামু আলায়কুম।

মাওলানা বললেন, ওয়ালাইকুম সালাম। তাঁর ভেতরে সামান্য অস্বস্তি কাজ করছে। একজন বিধর্মীর সালামের উত্তরে ওয়ালাইকুম সালাম বলা কি ঠিক হচ্ছে ? এই বিষয়ে হাদিস-কোরানের বিধানইবা কী ? নিজের স্বল্পজ্ঞানের জন্য নিজের উপরই রাগ লাগছে।

জীবনলাল ঘর থেকে বের হবার আগে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, মাওলানা সাহেব, একটা কথা। আপনার একটা বিষয় দেখে অবাক হয়েছি। হরিচরণ বাবু বিপুল বিষয়সম্পত্তি একজন অনাত্মীয় ছেলেকে দিয়ে গেছেন। এই বিষয়ে আপনার কোনো কৌতূহল হলো না কেন ?

মাওলানা বললেন, একটা হাদিসে পড়েছিলাম, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সালাম বলেছেন, 'প্রতিবেশীর বিষয়ে অকারণ কৌতূহল দেখাইবে না।' হাদিসটা মানি। তাছাড়া হরিচরণ বাবু অতি সাধু পুরুষ। উনি যা সিদ্ধান্ত নিবেন ঠিকই নিবেন। তারপরও আসল ব্যাপার অন্যখানে।

আসল ব্যাপার কী ?

সমস্ত সিদ্ধান্তই আল্লাহপাকের। উনি ঠিক করেছেন জহির বিপুল সম্পত্তির মালিক হবে। বাকি সবই উছিলা।

বান্ধবপুর বাজারে একজন ক্যাম্বেল পাশ এলএমএফ ডাক্তার আছেন। নাম সুধিন দাস। তিনি সারাবছরই নানান রোগব্যাধিতে শয্যাশায়ী থাকেন। আজও তাই। প্রবল জ্বরে তিনি অচেতন প্রায়। তাঁর দুই মেয়ের একজন তাঁর পায়ে তেল মালিশ করছে, অন্য মেয়ে মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে। এই অবস্থাতেই তিনি হরিচরণের বিষয়ে বিধান দিলেন, রসুন-সরিষার তেলের মালিশ। এতেই রাতটা নির্বিঘ্নে কাটবে। সকালে মিকচার দিয়ে দিব।

জীবনলাল বললেন, উনার বুকে ব্যথা। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

সুধিন ডাক্তার হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, রসুন এই রোগের একমাত্র বিধান। আজ অমাবস্যাও না, পূর্ণিমাও না। রোগী মারা যাবে না। বেশিরভাগ বৃদ্ধ মারা যায় অমাবস্যা পূর্ণিমার টানে। রোগী টিকে থাকবে। সকালে নাড়ি দেখে মিকচার দিব।

জীবনলাল সুধিন ডাক্তারের ঘর থেকে বের হলেন। বাজারে নামকরা একজন কবিরাজ থাকেন। চাঁদসির ক্ষত চিকিৎসা করেন। রাতে তিনি বাজারে থাকেন না। তাঁর বাড়ি খুঁজে বের করতে হলে স্থানীয় কারো সাহায্য দরকার। দুর্যোগের রাতে বাজারে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

মফিজ ভাই, এত রাতে এখানে কী করেন ?

ধনু শেখ ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেকখানি দূরে তাঁর তিনসঙ্গী। একজনের হাতে বর্শা। ধনু শেখের মুখ দিয়ে ভকভক করে দেশী মদের গন্ধ আসছে। জীবনলাল কিছু বলার আগেই ধনু শেখ বলল, আসল খবর কি শুনেছেন ?

আসল খবর কী ?

ময়মনসিংহ থেকে পুলিশের এসপি জনকিন্স সাহেব স্বয়ং এসেছেন লঞ্চ নিয়ে। তারা খবর পেয়েছেন, এই অঞ্চলে একজন বিপ্লবী লুকিয়ে আছে।

জীবনলাল কিছু বললেন না।

ধনু শেখ বলল, আপনাকে সাবধান করার জন্যে বললাম। আপনি তো সেই লোক, ঠিক বলেছি না ? আমার অনুমান ঠিক আছে না ভাইসাহেব ?

জীবনলাল বললেন, পুলিশকে খবর দিয়ে কি আপনি এনেছেন ?

ধনু শেখ বলল, আমি যদি পুলিশ খবর দিয়ে আনতাম— আপনাকে সাবধান করতাম না। পুলিশ নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হতাম। আপনাকে ধরিয়ে দিতাম। ব্রিটিশ রাজ বলত, মারহাবা। একটা কথা, আপনার সঙ্গে কি অস্ত্র আছে ?

জীবনলাল বললেন, আছে।

ধনু শেখ বলল, আমার বুদ্ধি শোনেন। নৌকা নিয়া হাওর পাড়ি দেন। ব্রিটিশ পুলিশ রাত বিরাতে হাওর পাড়ি দিবে না। তারা হাওর ভয় পায়। আমি নৌকার ব্যবস্থা করে দিব। আমার নিজের নৌকা আছে। ভালো মাঝি আছে।

জীবনলাল বললেন, আমাকে সাহায্য করতে চাচ্ছেন কেন ?

আপনাকে বন্ধু হিসেবে নিয়েছিলাম এই কারণে। আমি লোক খারাপ— তবে যত খারাপ সবাই ভাবে তত খারাপ না। একবার আমি যারে বন্ধু ভাবি সে বাকি জীবনের বন্ধু। আপনি আমার বন্ধু। আপনার সঙ্গে অনেক সুখ দুঃখের

আলাপ করেছি। এখন ইচ্ছা করলে আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। ইচ্ছা না করলে নাই।

জীবনলাল বললেন, নৌকা ঠিক করে দিন। হাওর পাড়ি দিব। তার আগে রঙিলা বাড়ির একটা মেয়েকে আমার দেখার শখ।

হতভম্ব ধনু শেখ বলল, রঙিলা বাড়ির মেয়ের সাথে আপনার কী ?

মেয়েটার রূপের প্রশংসা শুনেছি।

চান বিবির কথা বলছেন ? আসল নাম জুলেখা।

হ্যাঁ জুলেখা।

ধনু শেখ বিরক্ত গলায় বলল, খামাখা সবাই তার রূপের কথা বলে। এমন কিছু না। এরচে' পরী বিবি নামে একজন আছে— ছোটখাটো। কিন্তু ধানী মরিচ।

আমি জুলেখাকে একনজর দেখব।

চলেন ব্যবস্থা করে দেই। তবে দেরি করা ঠিক হবে না। ইংরেজ পুলিশ, এরা জোঁকের চেয়েও খারাপ। লবণ দিলে জোঁক ছেড়ে দেয়, ইংরেজ পুলিশ ছাড়ে না।

জীবনলাল দাঁড়িয়ে আছেন জুলেখার সামনে। ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। ধনু শেখ দরজার বাইরে। তার লোকজন নৌকা আনতে গেছে। নৌকা রঙিলা বাড়ির ঘাট থেকে ছাড়বে। রঙিলা বাড়ি জায়গাটা উঁচু। পুলিশের আগমন আগেই টের পাওয়া যাবে।

জীবনলাল বললেন, তোমার নাম জুলেখা ?

জুলেখা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

এই কাগজটা যত্ন করে রাখ।

কাগজটা কী ?

এটা একটা দানপত্র। হরিচরণ বাবুর দানপত্র। এর বেশি ব্যাখ্যা করতে পারব না। তুমি কি বাংলা পড়তে পার ?

পারি।

অবসর সময়ে পড়বে। আর এই পুঁটলিটা রাখ। পুঁটলিতে একটা রিভলবার আছে। আমার লোকজন এসে কোনো একদিন তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে।

রঙিলা বাড়ির ঘাটে নৌকা চলে এসেছে। জীবনলাল নৌকায়। ধনু শেখ বন্ধুকে বিদায় জানাতে নৌকায় উঠেছে। সে জীবনলালের হাত ধরে বলল, নিশ্চিন্ত মনে

যান। মাঝিকে বুঝিয়ে বলে দিয়েছি। সোজা চলে যাবেন মদনপুর। মদনপুর থেকে লঞ্চে উঠবেন সোজা নারায়ণগঞ্জ। একবার নারায়ণগঞ্জ পৌঁছলে কোনো বাপের ব্যাটা আপনেরে ধরতে পারবে না। ইচ্ছা করছে আমি নিজেই আপনার সঙ্গে যাই। সেটা সম্ভব না। অতিরিক্ত মদ্যপান করেছি। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। আচ্ছা ভাইসাহেব তাহলে বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।

পুলিশ তখন হরিচরণের বাড়ি ঘেরাও করেছে। বাড়িতে বারান্দায় মরে পড়ে থাকা বৃদ্ধ হরিচরণ, আর কেউ নেই। জীবনলাল নৌকা নিয়ে সরে পড়েছে, এই খবর তাদের কাছে অজানা।

এসপি জনকিন্সে'র কাছে ধনু শেখ হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। দ্রুত লঞ্চ নিয়ে হাওরের দিকে গেলে বিপ্লবী জীবনলালকে পাওয়া যাবে— এই খবর দেয়া হয়েছে। জীবনলালের সঙ্গে অস্ত্র আছে, এই তথ্যও জানানো হয়েছে। জনকিন্স সাহেব দলবল নিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন। যাবার আগে ধনু শেখকে বললেন, এই ভয়ঙ্কর বিপ্লবী যদি ধরা পড়ে তাহলে তিনি চেষ্টা নেবেন যেন ধনু শেখ 'খান সাহেব' টাইটেল পান।

তারিখ ১৩ই এপ্রিল। সন ১৯১৯। ব্রিটিশবিরোধী কর্মকাণ্ড তখন তুঙ্গে।

এই দিনেই পাঞ্জাবে জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে অমৃতসরের জালিওয়ানওয়ালাবাগে এক হাজার মানুষ নির্মমভাবে নিহত এবং দুই হাজার আহত হয়। ডায়ার তখনই কার্ফু জারি করে, যে কারণে কোনো চিকিৎসা সাহায্য না পৌঁছায়, ময়দানে ও রাস্তায় শত শত মানুষ প্রাণ ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ রাজের 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।

তুরস্কের সুলতান ছিলেন ভারতীয় মুসলমানসহ পৃথিবীর সকল সুন্নি মুসলমানের খলিফা। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষ নেয়ায় ব্রিটিশ রাজ সুলতানের পদচ্যুতি ঘটায়। সুলতানের অধিকার রক্ষার জন্যে শুরু হয় খেলাফত আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

ভয়ঙ্কর বিপ্লবী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়কে ধরিয়ে দেবার পুরস্কার হিসেবে ধনু শেখ 'খান সাহেব' উপাধি পেয়েছেন। জীবনলাল আছেন আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে। বিচার শুরু হয়ে যাবে। জীবনলালের ফাঁসি হবে, এ বিষয়টা মোটামুটি নিশ্চিত।

খান সাহেব ধনু শেখ বসে আছেন হরিচরণের বাড়ির উঠানে। মাঘ মাস। শীত পড়েছে প্রচণ্ড। তাঁর হাতে কাচের বড় গ্লাসভর্তি খেজুরের রস। খেজুরের রস খেতে হয় সূর্য উঠার আগে। বেলা হয়ে গেছে। রস খানিকটা টকে গেছে, তবে খান সাহেব ধনু শেখ টকে যাওয়া রস খেয়ে যথেষ্টই আনন্দ পাচ্ছেন। ইদানীং সবকিছুতেই তিনি আনন্দ পান। বেদানা নামের তের বছর বয়সি এক বালিকাকে সম্প্রতি বিবাহ করেছেন। মেয়েটি রূপবতী না। গাত্রবর্ণ কালো। মাথার চুল পিঙ্গল। তারপরেও তার সঙ্গে গল্পগুজব করেও তিনি আনন্দ পাচ্ছেন। কেন এরকম হচ্ছে তিনি জানেন না। তাঁর প্রথম স্ত্রী কমলার ধারণা, বেদানা জাদুটোনা করেছে। সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই, তা-না।

হরিচরণের বিষয়সম্পত্তির দখল ধনু শেখ নিয়ে নিয়েছেন। তেমন কোনো সমস্যা হয় নি। হরিচরণ নাকি মৃত্যুর আগে আগে কোম্পানির স্ট্যাম্পে সব দিয়ে গেছেন ধনু শেখকে। স্ট্যাম্পে তিনি দস্তখত করেছেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে দস্তখত সামান্য আঁকাবাঁকা হয়েছে। সে-কারণেই তিনি বুড়ো আঙুলের ছাপও দিয়েছেন। দু'জন সাক্ষীর দস্তখতও আছে। একজন প্রাক্তন জমিদার শশাংক পাল। অন্যজন অম্বিকা ভট্টাচার্য। মুসলমান হবার পর যার নাম সিরাজুল ইসলাম ঠাকুর।

ধনু শেখের কারণে জানা গেছে, হরিচরণ মৃত্যুর আগে আগে কলেমা তৈয়ব পাঠ করে মুসলমান হয়েছেন। তাঁকে দাহ্ করা হয় নি। মসজিদের পাশের গোরস্তানে তাঁর কবর হয়েছে। ধনু শেখ নিজ খরচায় কবর বাঁধিয়ে দিয়েছেন। কবরে লেখা— বিশিষ্ট দানবীর, সমাজসেবক মোহম্মদ আহম্মদ। যারা শেষ সময়ে মুসলমান হয়, আকিকা করে নাম রাখার সুযোগ হয় না, তাদের নাম

মোহম্মদ আহম্মদ রাখাই না-কি বিধান। কবরের ভেতর একটা স্বর্ণচাপা গাছ লাগানো হয়েছে। অল্পদিনেই গাছ তরতাজা হয়েছে। মাওলানা ইদরিস গাছটার যত্ন নেন। অজুর শেষে পানি ছিটিয়ে দেন। কবরের উপর গাছ থাকা রহমতের ব্যাপার। গাছ আল্লাহপাকের নাম জিগির করে, তার সোয়াবের কিছু অংশ কবরবাসী পায়। আল্লাহপাক তার বান্দাদের উদ্ধারের নানান ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

মাঝে মাঝে কবরের পাশে একজন তরুণীকে ঘোমটায় মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তার চোখে থাকে বিস্ময়।

একদিন মাওলানা ইদরিস অবাক হয়ে দেখলেন, মেয়েটি বাঁধানো কবরের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এমনভাবে হাত বুলাচ্ছে যেন সে ঘুমন্ত মানুষের গায়ে হাত বুলাচ্ছে। মাওলানা কৌতূহল সামলাতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, মাগো আপনি কে ?

তরুণী চমকে উঠে ভীত গলায় বলল, আমার নাম যমুনা।

এখানে কী করেন ?

কিছু না।

মেয়েছেলের উচিত না পুরুষের কবরে হাত রাখা।

আর রাখব না।

অনেকবার আপনারে এই কবরের কাছে আসতে দেখেছি। কেন আসেন ?

যমুনা ক্ষীণ গলায় বলল, আর আসব না।

মাঘ মাসের শীতের সকালে ধনু শেখের সঙ্গে সাক্ষী দু'জনও উপস্থিত। সিরাজুল ইসলাম ঠাকুর বসেছেন টুলে। তিনি দাড়ি রেখেছেন। মুখভর্তি চাপদাড়িতে তাকে খুব মানিয়েছে। ধনু শেখ তাকে স্থায়ী চাকরি দিয়েছেন। এখন মাসে পঁচিশ টাকা করে পান। বিনিময়ে হরিচরণের বাড়িঘর দেখাশোনা করেন।

শশাংক পাল হরিচরণের টিনের ঘরে থাকেন। তাঁর অরুচি রোগ হয়েছে। কোনোকিছুই হজম করতে পারেন না। তাঁকে লবণ দিয়ে সাগু জ্বাল দিয়ে দেয়া হয়। সকালবেলা চামচ দিয়ে তাই খানিকটা খান। কিছুক্ষণ পর পুরোটাই বমি করে দেন। ধনু শেখ কথা দিয়েছেন তাকে কোলকাতায় নিয়ে চিকিৎসা করাবেন। কোলকাতায় ধন্বন্তরী আয়ুর্বেদশাস্ত্রী আছেন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অরুচির ভালো চিকিৎসা আছে।

শশাংক পাল বললেন, খান সাহেব, আমরা যাব কবে ?

ধনু শেখ বললেন, সময় হলেই যাব। সময় এখনো হয় নাই।

সময় কবে হবে ?

ধনু শেখ বিরক্ত গলায় বললেন, ঢাকার কমিশনার সাহেব পাখি শিকারে আসবেন। পাখি শিকারের পরে যাব।

শশাংক পাল বললেন, ততদিন আমি বাঁচব না।

ধনু শেখ নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, মরে গেলে খাঁটি ঘি দিয়ে দাহ্‌র ব্যবস্থা করব। চিন্তার কিছু নাই।

শশাংক পাল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। কঠিন কিছু কথা তাঁর ঠোঁটে এসে গেছে। অনেক কষ্টে কথাগুলি আটকালেন। ধনু শেখ এখন এমন ব্যক্তি যার সঙ্গে কঠিন কথা বলা যায় না। সামলে কথা বলতে হয়।

ধনু শেখ গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, সিরাজ ঠাকুর ?

সিরাজ ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে বললেন, জে খান সাব।

এইবারের কোরবানির ঈদে মসজিদের সামনে আমি কোরবানি দিব বলে মনস্থ করেছি।

অবশ্যই দিবেন।

হিন্দুরা লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করতে পারে। করলে করবে। আপনি কী বলেন ?

অবশ্যই। তারা ধর্মকর্ম করবে, আমরা করব না— এটা কেমন কথা ? আমাদেরও ধর্মকর্মের হক আছে।

ধনু শেখ বললেন, মাগরিবের নামাজের সময় এরা মন্দিরে ঘণ্টা বাজায়। মুসুল্লিদের নামাজের অসুবিধা হয়। এরও একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। ঘণ্টা বাজাইতে দোষ নাই। নামাজের সময় বাদ দিয়ে।

সিরাজ ঠাকুর জোরের সঙ্গেই বললেন, অবশ্যই।

ধনু শেখ বললেন, ভালো দেখে একটা ঘোড়া খরিদ করা দরকার। ঘোড়া বিনা বিশিষ্ট মানুষের ইজ্জত রক্ষা হয় না।

সিরাজ ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, অবশ্যই। শাদা রঙের ঘোড়া, যেন দূর থেকে নজরে আসে।

শশাংক পাল বললেন, উ হুঁ। ঘোড়াতে কোনো ইজ্জত নাই। থানার ওসি ঘোড়ায় চড়ে। ইজ্জত হাতিতে। হাতি খরিদ করেন।

ধনু শেখ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর হাতি-ভাগ্য ভালো না। হরিচরণ বেকুবের মতো তাঁর হাতি আসামের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। সেই হাতি

ফিরে আসে নি। ধনু শেখ শাল্লার দশআনি জমিদার নেয়ামত হোসেনের কাছে হাতি কিনতে গিয়ে অপদস্ত হয়েছেন। নেয়ামত হোসেন ধনু শেখকে 'তুমি তুমি' করে বলেছেন, যেন ধনু শেখ তার অধস্তন কর্মচারী।

হাতি কিনতে চাও ?

জি। শুনেছি আপনি আপনার হাতি বিক্রি করবেন। খরিদ্দার অনুসন্ধান করছেন।

হাতি দিয়া তুমি করবা কী ?

বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আসা করতে হয়।

পালকিতে যাওয়া আসা করবা। হাতি একটা ইজ্জতের প্রাণী। তার ইজ্জতের দিকে আমাদের লক্ষ রাখা দরকার। যে মুচি, জুতা সেলাই করে, তার বাড়িতে হাতি দেওয়া যায় না। এতে হাতির ইজ্জতের হানি হয়।

ধনু শেখ আহত হয়ে বলেছেন, আমি কি মুচি ?

নেয়ামত হোসেন হাই তুলতে তুলতে বলেছেন, কথার কথা বলেছি। নিজের ঘাড়ে টান দিয়া নিবা না। ছোটলোকের স্বভাব কি জানো ? সবকথা নিজের ঘাড়ে টান দিয়া নেয়। সে ভাবে সবাই তাকে অপমান করতে নামছে। তুমি বড় মানুষ হওয়ার চেষ্টায় আছ— এইসব শিখবা না ?

ধনু বিড় বিড় করে বলেছেন, অবশ্যই। অবশ্যই।

নেয়ামত হোসেন হুঁকোয় টান দিয়ে উপদেশের ভঙ্গিতে বলেছেন, হাতির চিন্তা বাদ দাও। আমার কথা শোন, হাঁটাহাঁটির মধ্যে থাক। এতে শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে। শরীর ঠিক রাখা প্রয়োজন না ?

ধনু শেখ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আমি উঠি।

নেয়ামত হোসেন দরাজ গলায় বললেন, আরে এখনই কি উঠবা ? শরবত খাও, মিষ্টি খাও। মিষ্টি মুখে না দিয়া আমার বাড়ি থেকে কেউ যায় না। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ জরুরি কিছু কথাও ছিল।

কী কথা ?

দুষ্ট লোকে বলে, তুমি নাকি মরা হরিচরণের আঙুলের ছাপ দিয়া দলিল বানিয়েছ— এটা কি সত্য ?

দুষ্ট লোকটা কে ?

দুষ্ট লোকের আলাদা পরিচয় থাকে না। তারা গলায় সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ঘুরে না। কথা সত্য কিনা বলো।

নেয়ামত হোসেন চেয়ারে গা এলিয়ে গড়গড়া টানছেন। তাঁর চোখ বন্ধ। ধনু শেখকে আচমকা এই প্রশ্ন করে 'তবদা' বানিয়ে দিতে পারার আনন্দেই তিনি আত্মহারা। তবে ধনু শেখ জবাব দিলেন। এই জবাব শোনার জন্যে নেয়ামত হোসেন প্রস্তুত ছিলেন না। নেয়ামত হোসেন মনে মনে ধনু শেখের সাহসের প্রশংসা করলেন।

ধনু শেখ বললেন, দুষ্ট লোক বা শিষ্ট লোক আমার বিষয়ে কী কথা বলেছে আমি জানি না, তবে আপনার কাছে স্বীকার করছি— ঘটনা সত্য!

নেয়ামত হোসেন বললেন, ঘটনা সত্য ?

জি জনাব সত্য। হরিচণের না আছে কোনো ওয়ারিশান না আছে কিছু। তার বিষয়সম্পত্তি সাত ভূতে লুটে খাবে, এটা কেমন কথা! এইসব বিবেচনা করে দখল নিয়েছি। জনাব, উঠি ?

হাতি বিষয়ক এইসব কথাবার্তা যখন হয়েছে তখনো ধনু শেখ 'খান সাহেব' হন নাই। জমিদার নেয়ামত হোসেন তাকে অপমান করতে পারে। ধনু শেখ অপমান গায়ে মাখেন নাই। হাসিখুশি অবস্থায় বাড়ি ফিরেছেন। বালিকাবধূর সাথে লুডু খেলেছেন। তিন দান খেলা হয়েছে। দুইবারই তিনি জিতেছেন। বেদানা লুডুতে হারার অপমান নিতে না পেরে কান্নাকাটি করেছে। তাকে শান্ত করতে ধনু শেখের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।

বেদানাকে ধনু শেখ বড়ই পিয়ার করেন। তাঁর এই বালিকাবধূ ভাগ্যবতী। তাকে বিয়ে করার পরই আচমকা 'খান সাহেব' টাইটেল। ইংরেজ জাতি হিসেবে ভালো, তারা উপকারীর উপকার ভোলে না।

ধনু শেখ ধরেই নিয়েছিলেন টাইটেল পাওয়ার পর নেয়ামত হোসেনের বাড়িতে তার দাওয়াত হবে। তা হয় নি। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনবার লোক মারফত খবর পাঠিয়েছেন। নেয়ামত হোসেন কথা বলতে চান। বিশেষ জরুরি।

প্রথমবার খবর পাঠালেন তার নিজ বাড়িতে ডাকাতি হবার পর। দ্বিতীয়বার খবর পাঠালেন, তার বজরায় ডাকাত দলের গোলাগুলির ঘটনার দিনে। তৃতীয় দফায় খবর পাঠিয়েছেন কিছুদিন আগে। ধনু শেখ ঠিক করে রেখেছেন, যাবেন। সদর খাজনা দেবার তারিখ হবার আগে আগে। নেয়ামত হোসেন যেন সদর খাজনা দিতে না পারেন এই ব্যবস্থা তিনি নিয়ে রেখেছেন। টাকা নিয়ে যারা যাবে তারা ডাকাতের হাতে পড়বে। দুই চারজনের প্রাণহানী ঘটবে। কী আর করা। সবই উপরের হুকুম। জগত চলে উপরের হুকুমে, মানুষের করার কিছু নাই। ভালো ব্যবস্থা। তবে সব ব্যবস্থা সবসময় কাজ করে না।

মাওলানা ইদরিস হাফেজ টাইটেলের পরীক্ষায় ফেল করেছেন। দেওবন্দে চারজন হাফেজের সামনে পরীক্ষা দিতে বসে পদে পদে ভুল করেছেন। চারজন হাফেজই বিরক্ত হয়েছেন, যদিও তাঁরা মনের ভাব প্রকাশ করেন নি।

একজন মাওলানা ইদরিসের কাঁধে হাত রেখে বলেছেন, সবাই হাফেজ হতে পারে না। হওয়ার প্রয়োজনও নাই। আপনি এই পথ ছেড়ে দেন। আল্লাপাকের কালাম ভুলভাল বলে আপনি মহাপাপী হচ্ছেন। প্রয়োজন কী ?

মাওলানা বললেন, এক দুই বৎসর পরে আবার আসি ? আপনাদের চারজনকে একসঙ্গে দেখে ভয় পেয়েছি বিধায় সব আউলা ঝাউলা হয়েছে।

এক বৎসর পর যখন আসবেন তখনো তো আমরা চারজনই থাকব। তখন কি মাথা আউলা হবে না ?

মাওলানা ইদরিস এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি। বিষণ্ন হৃদয়ে বান্ধবপুরে ফিরে এসেছেন। হাফেজ টাইটেল পাওয়ার পর বিবাহ করবেন এরকম বাসনা ছিল। সেই বাসনা এখন তার আর নেই। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোরান মজিদ আবারো ভালোমতো মুখস্থ করবেন। আবারো দেওবন্দ যাবেন। শুদ্ধ নিয়তের প্রতি আল্লাহপাকের মমতা আছে। তাঁর নিয়ত শুদ্ধ।

বৈশাখ মাসের এক রাত। মসজিদে এশার নামাজ শেষ করে মাওলানা বাড়ি ফিরে দেখেন ভেতর বাড়িতে হারিকেন জ্বলছে। তিনি খুবই বিস্মিত হলেন। তাঁর বাড়ি থাকে অন্ধকার। তিনি এসে হারিকেন জ্বালান। কে এসে বাড়িতে হারিকেন জ্বালাবে ? তাঁর ক্ষীণ সন্দেহ হলো, জহির হয়তো ফিরে এসেছে। জহিরের নিরুদ্দেশের খবর তিনি উকিল মুনসির মাধ্যমে পেয়েছেন।

মাওলানা উঠানে দাঁড়িয়ে বললেন, কে ?

ভেতর থেকে নারীকণ্ঠে কেউ একজন বলল, আমি।

মাওলানা বললেন, আপনার পরিচয় ?

আমার নাম জুলেখা, আমি জহিরের মা। মাওলানা সাহেব, আপনাকে আসসালাম।

মাওলানার শরীর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। কী সর্বনাশের কথা! রঙিলা বাড়ির অতি পাপিষ্ঠ নারীদের একজন তার ঘরে। জানাজানি হলে বিরাট সর্বনাশ হবে। জানাজানি না হলেও ঘরদুয়ার অপবিত্র হয়েছে। কুকুর যে ঘরে ঢুকে সেই ঘর নাপাক হয়ে যায়। সেখানে নামাজ হয় না। এরা তারও অধম।

জুলেখা বলল, মাওলানা সাহেব, ভেতরে আসবেন ? আপনার সঙ্গে দুইটা কথা বলব।

মাওলানা বললেন, আপনি আমার বাড়িতে এসে বিরাট অন্যায় করেছেন।

অন্যায়ের জন্যে ক্ষমা চাই। আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা ছিল বলে এসেছি। কথা শেষ করে চলে যাব।

মাওলানা বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কোনো কথা নাই। আপনি চলে যান।

বাড়ির ভেতর থেকে মৃদু হাসির শব্দ পাওয়া গেল। এই পরিস্থিতিতে কোনো মেয়ে হাসতে পারে তা মাওলানার কল্পনাতেও নেই। মাওলানা বললেন, আপনাকে আল্লাহর দোহাই লাগে আপনি চলে যান।

জুলেখা বলল, আমি যে আপনার স্ত্রী এইটা কি জানেন ?

মাওলানা হতভম্ব গলায় বললেন, তুমি কী বললা ?

মাওলানা এতক্ষণ আপনি করে বলছিলেন, হঠাৎ তুমি সম্বোধনে চলে গেলেন।

জুলেখা শান্ত গলায় বলল, পুরান কথা মনে কইরা দেখেন। আপনের কলেরা হয়েছিল। আপনি মরতে বসেছিলেন। আমি ছিলাম আপনার সাথে। আপনার সেবা করেছিলাম। মনে আছে ?

মাওলানা চাপা গলায় বললেন, মনে আছে।

জুলেখা বলল, এক রাতে আপনি আমারে বললেন, কোনো অনাত্মীয় তরুণী পুরুষের সেবা করতে পারে না। দুইজনেরই বিরাট পাপ হয়। তখন আমি বললাম, এক কাজ করেন, আমাকে বিবাহ করেন। আপনার কি মনে আছে ?

মাওলানা চুপ করে রইলেন। তাঁর হাত-পা কাঁপতে লাগল। এই মেয়েটা ভয়ঙ্কর কথা বলছে। মেয়েটা মিথ্যাও বলছে না। তাঁর আবছা আবছা মনে পড়ছে।

জুলেখা বলল, আপনার মনে না থাকলেও আমি আপনাকে দোষ দিব না। আপনি তখন মরতে বসেছিলেন। মৃত্যুর সময় মানুষ অনেক কিছু করে। আপনি কি উঠানে দাঁড়ায়ে থাকবেন ? ভেতরে আসবেন না ?

মাওলানা এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। তিনি হঠাৎ লক্ষ করলেন, তাঁর কথা বলার শক্তি চলে গেছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। ইবলিশ শয়তান আশেপাশে আছে এটা বোঝা যাচ্ছে। সে মজা দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে। মাওলানা বিড়বিড় করে বললেন, আল্লাহপাক আমাকে ইবলিশের হাত থেকে বাঁচাও।

জুলেখা ঘরের ভেতর থেকে উঠানে এসে দাঁড়াল। তার সমস্ত শরীর বোরকায় ঢাকা। চিকের পর্দার আড়ালে চোখ। অন্ধকারের কারণে সেই চোখও দেখা যাচ্ছে না। জুলেখা বলল, তখন আপনি আমারে কবুল বলতে বলেছিলেন। আমি বলেছিলাম। আপনার হাত ধরে তিনবার বলেছি— কবুল, কবুল, কবুল।

মাওলানা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, তুমি বলেছিলে, আমি বলি নাই।

আপনি বলেছিলেন। ইয়াদ করে দেখেন।

আমার ইয়াদ নাই।

আমি আপনারে ফেলে চলে যেতাম না। আমি ভেবেছিলাম আপনার মৃত্যু হয়েছে। চলে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো পথ ছিল না।

মাওলানা বললেন, এইটাই কি তোমার জরুরি কথা ?

জুলেখা বলল, এইটা কোনো জরুরি কথা না। রোগের যন্ত্রণায় আপনি কী করেছেন না করেছেন সেটা কিছু না। আমার কথাবার্তা শুনে আপনি বড়ই অস্থির হয়েছেন। মন শান্ত করেন। মন শান্ত করার জন্য তিনবার তালাক বলে দেন। আমাদের ধর্মে বিবাহ যেমন সোজা তালাকও তেমন সোজা।

ধর্ম নিয়া কথা বলবা না।

গোস্তাকি হয়েছে। আর বলব না।

জরুরি কথাটা বলো।

আমার কাছে একটা কাগজ আছে। দানপত্র। জীবনলাল নামের এক লোক পাঠায়েছে। সেখানে আপনার দস্তখত আছে।

মাওলানা দ্বিতীয়বার চমকালেন।

জুলেখা বলল, ধনু শেখ এতবড় অন্যায় করেছে, আপনি সব জেনেও কিছু বলেন নাই।

মাওলানা বিড় বিড় করে বললেন, আমি ছোট মানুষ।

জুলেখা বলল, আপনি আল্লাওলা মানুষ। আল্লাওলা মানুষ জানে মানুষের মধ্যে বড় ছোট নাই। সবাই সমান। আপনি জানেন না ?

মাওলানা চুপ করে রইলেন।

জুলেখা বলল, কাগজটা কি আপনার কাছে রেখে যাব ?

মাওলানা বললেন, না। তুমি চলে যাও।

জুলেখা বলল, এক কথায় চলে যাব ? আমি আপনার স্ত্রী। ভাব ভালোবাসার দুইটা কথা বলেন। শুইন্যা যাই।

তুমি চলে যাও।

জুলেখা বলল, আপনার কাছে একটা প্রস্তাব আছে। দোষ না নিলে প্রস্তাবটা দিব। দোষ ধরলেও দিব।

কী প্রস্তাব ?

চলেন অনেক দূরের কোনো দেশে চইল্যা যাই। যেখানে আপনারে কেউ চিনে না। আমারেও না।

তুমি অতি পাপিষ্ঠ।

জুলেখা হাসতে হাসতে বলল, আপনার মতো এত বড় মাওলানা যার স্বামী তার চিন্তা কী ? সে তওবা করায়া আমারে পবিত্র করব।

স্বামী নাম আর কোনোদিন মুখে আনবা না।

আচ্ছা আনব না।

এখন বিদায় হও। তোমার সাথে কথা বলাও পাপ।

জুলেখা বলল, অনেক পুণ্য তো সারাজীবন করেছেন। কিছু পাপ করলেন। এই বিষয়ে আমার বাপজানের একটা গান আছে। শুনবেন ?

চুপ বললাম। চুপ।

জুলেখা নিচু গলায় গান ধরল—

ভালো চিনতে মন্দ লাগে
মন্দ চিনতে ভালো।
শাদা কেউ চিনে না বান্ধব
না থাকিলে কালো।

মাওলানা উঁচু গলায় বললেন, বিদায় হও। বিদায়।

জুলেখা হাঁটা শুরু করল। মাওলানা তাকিয়ে আছেন। কালো বোরকার কারণে জুলেখা মুহূর্তের মধ্যেই অন্ধকারে ঢেকে গেল। মাওলানা অনেক রাত পর্যন্ত উঠানে বসে আল্লাহর নাম জপলেন। কিছুক্ষণ পর পর হাত উঠিয়ে মোনাজাত করলেন, হে আল্লাহপাক, তুমি আমাকে একটা ইশারা দাও। বলে দাও আমি কী করব।

মাওলানার শরীর দিয়ে ঘাম পড়ছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন পায়ের থপথপ শব্দ। তাকে ঘিরে কে যেন হাঁটছে। নাকে কটু গন্ধ আসছে। পশুদের গা থেকে যেমন গন্ধ আসে তেমন গন্ধ। আকাশে মেঘ করেছিল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। বৃষ্টির ফোঁটাগুলি গরম। এরকম তো কখনো হয় না।

খান সাহেব ধনু শেখ শাল্লার জমিদার বাড়িতে এসেছেন। খান সাহেব হবার পর এটা তাঁর প্রথম আসা। আয়োজন করে আসা উচিত। তা-না, তিনি একা

এসেছেন, খালি পায়ে এসেছেন। তাঁর দুই পাভর্তি ধূলা। পায়ের ধূলা ধুয়ে ফেলার জন্যে তাঁকে রূপার বদনা ভর্তি করে পানি দেয়া হয়েছে। একজন খানসামা তাঁর পায়ে পানি ঢালছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখছেন নেয়ামত হোসেন। তাঁর চোখ তীক্ষ্ম। মুখ গম্ভীর। নেয়ামত হোসেন বললেন, খান সাহেব মানুষ খালি পায়ে পথ চলে, এটা কেমন কথা ?

ধনু শেখ বললেন, ঠিক করেছি হাতি খরিদ না করা পর্যন্ত খালি পায়ে হাঁটব। এইটা আমার একটা জিদ।

খারাপ না। পুরুষমানুষের জিদ থাকা ভালো। আমার কাছে কী জন্যে এসেছেন ?

ধনু শেখ মনে মনে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মানুষটা 'আপনি' বলা শুরু করেছে। ধনু শেখ বললেন, আপনি কয়েকবার খবর পাঠিয়েছেন দেখা করার জন্য। নানান কাজকর্মে থাকি, সময় করতে পারি নাই। আজ আমি অবসর। ভাবলাম যাই। গফসফ করে আসি। আপনার মতো বিশিষ্ট মানুষ থাকতে আমার গফের মানুষ নাই। এটা আফসোসের বিষয়।

নেয়ামত হোসেন ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আপনি অবসর এই জন্যে এসেছেন এটা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ ছাড়া আপনি আসেন নাই। কারণটা বলেন।

সদর খাজনার সময় হয়েছে। টাকার জোগাড় কি হয়েছে ?

নেয়ামত হোসেন বললেন, খাজনার টাকা আছে। যদিও কয়েকবার আমার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা কিছু নিতে পারে নাই— এই খবর আপনার জানার কথা।

ধনু শেখ বললেন, আমি কী করে জানব ? আমি তো ডাকাতের দলে ছিলাম না। না-কি আপনার ধারণা আমিও ছিলাম ?

নেয়ামত কিছু বললেন না। ধনু শেখের এ বাড়িতে আসার উদ্দেশ্য এখনো পরিষ্কার হচ্ছে না। খারাপ কোনো মতলব আছে এটা বোঝা যাচ্ছে।

ধনু শেখ বললেন, জমিদার সাব। আপনাকে অত্যধিক চিন্তাযুক্ত মনে হইতেছে। আমি কী কারণে আসছি বুঝতে পারতেছেন না বইলা চিন্তিত। আমি আসছি আপনারে সাবধান করতে।

আমাকে সাবধান করতে এসেছেন ?

ধরেন সদর খাজনা নিয়া আপনার ম্যানেজার রওনা হইল। পথে পড়ল ডাকাতের হাতে। বিপদ না ? খাজনা দিতে পারলেন না। জমিদারি উঠল নিলামে। শশাংক পালের ঘটনা।

নেয়ামত হোসেনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি 'তুমি'তে ফিরে গেলেন। কঠিন গলায় বললেন, তুমি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ ? ডাকাতির ভয় ?

ধনু শেখ বললেন, আপনি ব্যবস্থা ভালো নিয়েছেন। এমন এক পথে খাজনা যাবে যে পথে কেউ যায় না। খাজনা যাবে ঘোড়ার পিঠে। মিশাখালির বাজারের পথে। ঠিক বলেছি না ? আপনার নিজের লোকই যদি সব বলে দেয় তখন তো ভয় আপনাতেই আসে। তার উপরে দেশ ভর্তি হয়েছে স্বরাজের বোমাবাজদের দিয়ে। টাকা লুটপাটে এরা ওস্তাদ। এরা পরিচয় দেয় স্বদেশী, বিপ্লবী। আসলে ডাকাত।

নেয়ামত হতভম্ব। সদর খাজনা মিশাখালি বাজার দিয়ে ঘোড়ার পিঠে যাবে এটা সত্য। এই সত্য বাইরের মানুষের জানার কথা না।

ধনু শেখ উঠে দাঁড়ালেন। চলে যাবার প্রস্তুতি। নেয়ামত হোসেন বললেন, একটু বসেন।

জরুরি কাজ ছিল।

একটু আগে বলেছেন আজ আপনি অবসর। গফসফ করতে এসেছেন।

ও আচ্ছা, আসলেই তো আজ কোনো কাজকর্ম নাই।

দুপুরে আমার সঙ্গে খানা খান।

ধনু শেখ বললেন, মন্দ না। আপনার বাবুর্চির সুনাম শুনেছি। তার হাতের রান্ধন চাখবার সৌভাগ্য হয় নাই। আমি বিরাট ভাগ্যবান।

নেয়ামত বললেন, আপনার সঙ্গে আমি কোনো বিবাদে যেতে চাই না। আপোস করতে চাই। আপনি বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়েছেন। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরে দেখবে এই নিয়ম। আপনি আমার স্বার্থ দেখবেন, আমি আপনার স্বার্থ দেখব।

ধনু শেখ বললেন, অবশ্যই। খাঁটি কথা বলেছেন। এই কথার দাম লাখ টাকার উপরে।

নেয়ামত বললেন, মাঝে মাঝে আমরা দুই ভাই মজলিশে বসব। গানবাজনা হবে। লখনৌ-এর এক বাইজি আমার এখানে আছে। শুনেছেন বোধহয়।

শুনেছি।

তার ঘাঘড়া নৃত্য দেখার মতো জিনিস। আজ রাতেই নাচের ব্যবস্থা করব, যদি মেয়েটার শরীর ভালো থাকে।

ধনু শেখ বললেন, আপনার বিরাট মেহেরবানি।

নিয়ামত বললেন, আমার খাজনা নিয়ে যখন যাবে তখন তাদের সাথে আপনার কয়েকজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে দিবেন।

অবশ্যই।

নেয়ামত বললেন, এক কাজ করুন, রাত পর্যন্ত থাকেন। রাতে ভালো আয়োজন করি। সামান্য গানবাজনার আয়োজনও থাকল।

মন্দ না।

ধনু শেখ গিয়েছিলেন খালি পায়ে, ফিরলেন হাতিতে চড়ে। নেয়ামত হোসেন বন্ধুকে হাতিতে করে ফেরত পাঠালেন।

এত করেও শেষরক্ষা হলো না। নেয়ামত হোসেনের খাজনার দলে ডাকাত পড়ল। বন্দুকের গুলিতে নেয়ামত হোসেনের তহসিলদার এবং এক নায়েব মারা গেল। স্বদেশী ডাকাতদের কাজ। এদের জন্যে টাকা পয়সা নিয়ে বের হওয়াই মুশকিল। পুলিশের এসপি সাহেব স্বয়ং নিজে কয়েকবার এসে তদন্ত করে গেলেন। কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

ধনু শেখের শরীর ভালো না। জ্বর জ্বর ভাব। সারাদিনই তিনি বিছানায় শুয়ে কাটিয়েছেন। সন্ধ্যার পর বেদানার সঙ্গ সাপলুডু নিয়ে বসেছেন। সাপলুডু পুরোপুরি ভাগ্যের খেলা। বেদানার গুটি খাওয়ার পারদর্শীতা সাপলুডুতে কাজে লাগে না। তারপরেও এই খেলাতেও সে জেতে। ধনু শেখ ভালোই খেলছিলেন। তার গুটি তরতর করে উঠে যাচ্ছিল। নিরান্নব্বইতে এসে সাপের মুখে পড়ে দুইয়ের ঘরে চলে যেতে হলো। বেদানার মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। দু'জনেরই বড় সুখের সময়।

সুখের সময়ে বাঁধা পড়ল। সিরাজুল ইসলাম ঠাকুর এসে খবর দিল, জুম্মাঘরের ইমাম এসেছেন। দেখা করতে চান।

ধনু শেখ বললেন, এখন ব্যস্ত আছি। পরে আসতে বলো।

তিন দান লুডু খেলা হলো। তিনটিতেই বেদানা জিতল। ধনু শেখ হাই তুলতে তুলতে বললেন, ঐ বান্দি, তোর সাথে পারা মুশকিল।

স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত মমতা তৈরি হলে ধনু শেখ তাকে 'বান্দি' সম্বোধন করেন এবং তুই তোকারি করেন।

বেদানা বলল, আপনের শরীর কি এখনো খারাপ ?

ধনু শেখ বললেন, হুঁ। দুই দানা আফিং খাইলে মনে হয় শরীর ঠিক হইত। [সে-সময় আবগারী দোকানে আফিম বিক্রি হতো। যে-কেউ আফিম কিনে খেতে পারত।]

বেদানা বলল, আফিং খান। দুধ জ্বাল দিয়া দিতে বলি, দুধ দিয়া খান।

ধনু শেখ বললেন, শরাব খাইলেও চলে। শরাব শরীর ম্যাজমেজানির আসল ওষুধ।

বেদানা বলল, শরাব খাইতে চাইলে খান। গেলাস দিতে বলি ?

বল।

শরাব আর আফিং একসাথে খাইলে কী হয় ?

কিছুই হয় না। 'নিশা' ভালো হয়।

দুইটা একসাথে খান। আমিও আপনের সাথে খাব।

মেয়েছেলের এইসব খাওয়া ঠিক না।

ঠিক না হইলেও খাব। আপনের গেলাসে একটা চুমুক দিব।

ধনু শেখ দরাজ গলায় বললেন, আচ্ছা যাও দিও।

অতি আনন্দময় এই মুহূর্তে খবর পাওয়া গেল, মাওলানা ইদরিস যায় নি। এখনো বৈঠকখানায় বসে আছে। ধনু শেখের বিরক্তির সীমা রইল না। তিনি মাওলানাকে শোবার ঘরেই ডাকলেন। বেদানাকে কিছু সময়ের জন্যে বাইরে পাঠালেন। বেদানা পুরোপুরি গেল না। দরজায় কান পেতে রাখল। পুরুষ মানুষদের জটিল কথা শুনতে তার বড় ভালো লাগে। মামলা মোকদ্দমার কথা, ব্যবসার কথা। এদের কথাবার্তার ধরনই অন্যরকম।

আসসালামু আলায়কুম।

ওয়ালাইকুম সালাম। মাওলানা, তোমার কী ব্যাপার ? [ধনু শেখ আগে মাওলানাকে আপনি করে বলতেন। খান সাহেব হবার পর থেকে তুমি বলছেন।]

আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

শরীরটা ভালো না। কথা শোনার মতো মনের অবস্থা না। তারপরেও বলো।

হরিচরণ বাবুর বিষয়সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা নিয়া একটা দলিল হয়েছিল, এই বিষয়ে কি আপনি জানেন ?

ধনু শেখ বিরক্ত গলায় বললেন, জানব না কেন ? দলিল আমার কাছে। আরেকটা কথা, তুমি হরিচরণ হরিচরণ করতেছ কোন কামে ? তার নাম মোহম্মদ আহম্মদ।

মাওলানা বললেন, আপনার কাছে যে দলিল আছে তার বিষয়ে বলতেছি না। মূল দলিল।

গাধার মতো কথা বলবা না। তুমি মাওলানা, গাধা না।

দলিলটা একজনের কাছে রক্ষিত আছে।

তোমার কথা কি শেষ হয়েছে ? কথা শেষ হয়ে থাকলে বিদায় হও। লোকমুখে শুনেছি তুমি হাফেজি পরীক্ষায় ফেল করেছ। এটা কি সত্য ?

জি জনাব।

ফেলটুস মাওলানা দিয়ে তো আমাদের চলবে না। তুমি অন্য কোনোখানে কাজ দেখ। আমি পাশ করা ভালো মাওলানার সন্ধানে আছি। বুঝেছ কি বলেছি ?

জি।

এখন বিদায় হও। জুমার নামাজের খুতবা ঠিকমতো পড়তে পার তো ? না-কি তোমার পেছনে দাঁড়ায়ে আমরা সবাই গুনাগারি হইতেছি ? দাঁড়ায়া থাকবা না, যাও বিদায়।

মাওলানা চলে গেলেন। ধনু শেখ শরাব নিয়ে বসলেন। বেদানার এক চুমুক খাওয়ার কথা, সে কয়েক চুমুক খেয়ে ফেলল। মুখ বিকৃত করে বলল, মজা পাইতেছি না তো।

ধনু শেখ বললেন, ঝিমভাব হয়, এইটাই মজা।

আমার তো ঝিমভাব হইতেছে না। আরো একটা চুমুক দিব ?

ধনু শেখ দরাজ গলায় বললেন, দেও।

বেদানা বড় করে চুমুক দিয়ে শাড়ির আঁচলে ঠোঁট মুছতে মুছতে বলল, মূল দলিল কার কাছে খোঁজ নেয়া উচিত না ?

ধনু শেখ বিস্মিত হয়ে বললেন, দলিলের বিষয়ে তুমি কি জানো ?

আড়াল থাইক্যা শুনছি।

কাজটা ঠিক কর নাই।

আপনেরে এক নিমিষ না দেখলে অস্থির লাগে, এইজন্যে দরজার চিপা দিয়া দেখতে ছিলাম। ভুল হইলে মাফ চাই। এই আপনের পায়ে ধরলাম।

ভুল তো অবশ্যই হয়েছে।

বেদানা বললেন, মূল দলিল উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন।

ধনু শেখ বললেন, মূল দলিল বইল্যা কিছু নাই। আমি যখন হরিচরণের বাড়িতে উপস্থিত হইলাম তখন সে মইরা 'চেগায়া' পইড়া আছে। তার দলিল লেখনের সময় কই ? আর দলিল কইরা সে কারে বিষয়সম্পত্তি দিবে ? তার আছে কে ?

বেদানা বলল, আমরার মাওলানা সাব কিন্তু মিথ্যা কথা বলে না।

মিথ্যা বলে না এইটা ঠিক আছে, তবে ভুলভাল কথা বলে। তার মাথাতে সামান্য দোষও আছে। ঐদিন আমারে বলতেছিল সে না-কি ইবলিশ শয়তানরে দেখছে। তার সঙ্গে কথা হয়েছে। এইসব মাথাখারাপ লোকের কথা।

বেদানা আগ্রহের সঙ্গে বলল, ইবলিশ শয়তান দেখতে কেমন ? জিজ্ঞাস করছিলেন ?

না।

আমার জানতে ইচ্ছা করতেছে। উনারে খবর পাঠায়া আনাই ?

ঝামেলা করবা না। আমি ঝামেলা পছন্দ করি না। গ্লাস শেষ হইছে। গ্লাসে জিনিস দাও।

বেদানা গ্লাস ভর্তি করে দিল।

পরের বছর নেয়ামত হোসেনের জমিদারি নিলামে উঠল। খান সাহেব ধনু শেখ জমিদারি কিনে নিলেন। জমিদারি কেনা উপলক্ষে তিনি বান্ধবপুরের সবার জন্যে মেহমানির আয়োজন করলেন। হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ নাই, সবাই খাবে। হিন্দুদের পাক ব্রাহ্মণ বাবুর্চি করবে। তাদের পাক এক জায়গায়, মুসলমানদের পাক আরেক জায়গায়। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা খাওয়ার শেষে এক টাকা করে পাবেন। মুসলমানদের ক্ষেত্রে শুধু সৈয়দ বংশীয়দের জন্যে এই ব্যবস্থা। খাওয়াদাওয়ার শেষে সারারাত যাত্রা পালা। পালার নাম 'রাজা হরিশচন্দ্র'। মেয়েরাও যেন যাত্রা দেখতে পারে সে ব্যবস্থা হয়েছে। চিক দিয়ে ঢেকে একটা অংশ আলাদা করা হয়েছে।

খান সাহেব ধনু শেখ রাত জেগে যাত্রা দেখলেন। রাজা হরিশচন্দ্রের দুঃখে বারবার তাঁর চোখ পানিতে ভর্তি হয়ে গেল।

ইদুল ফিতরের নামাজ শেষ হয়েছে। কোলাকুলিপর্ব শুরু হবার আগে আগে মাওলানা ইদরিস বললেন, সুলেমান আপনাদের কিছু বলবে।

কাঠমিস্ত্রি সুলেমান মাওলানার পাশে এসে দাঁড়াল। তার মুখ বিষণ্ন। চোখে হতাশা ও লজ্জা। সে কারো দিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু করে যে কথা বলল তার অর্থ— সে অনেকের কাছে দেনাগ্রস্ত। দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দেবার পর দেনমোহরানার টাকা দিতে হওয়ায় বসতবাড়ি এবং সামান্য যে জমি ছিল বিক্রি করতে হয়েছে। উপায় না দেখে আজ থেকে সে নিজেকে ভিক্ষুক ঘোষণা করেছে। কাঠের কাজ সে আজ থেকে করবে না। বাকিজীবন ভিক্ষা করে কাটাবে। ভিক্ষার সুবিধার জন্যে সে একটা ঘোড়া কিনেছে। সে সবার দয়া এবং করুণা চায়।

ঘোষণা করে ভিক্ষুক হবার প্রচলন তখন ছিল। পাওনাদারদের হাত থেকে চিরমুক্তির একটাই পথ।

ঈদের দিন থেকেই সুলেমান ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষাবৃত্তির নতুন জীবন শুরু করল। ঘোড়ার পিঠে দু'টা বস্তা বাঁধা। একটা চালের জন্যে, একটা ধানের জন্যে। ঘোড়া নিয়ে সে একেক বাড়ির সামনে দাঁড়াচ্ছে। ক্ষীণ গলায় বলছে— 'ভিক্ষুক বিদায় করেন গো।' ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধা। মাথা নাড়লে ঘণ্টাও বেজে উঠছে। ভিক্ষুকের ঘোড়ার ঘণ্টাধ্বনিও গিরস্তজনের চেনা। কেউ চাল আনে, কেউ ধান। ঘোড়ায় চড়া ভিক্ষুকের সামাজিক অবস্থান খারাপ না। এরা ভিক্ষা পায়।

খান সাহেব ধনু শেখ দয়াপরবশ হয়ে সুলেমানকে থাকতে দিয়েছেন। তার স্থান হয়েছে হরিচরণের পুরনো বাড়িতে। শশাংক পালও সেখানেই থাকেন। তিনি এখন পুরোপুরি শয্যাশায়ী। সারাদিন উঠানে পড়ে থাকেন, সন্ধ্যার পর তাকে ধরাধরি করে ঘরের ভেতর নিয়ে যাওয়া হয়। ঘরে নিয়ে যাওয়া, পানি খাওয়ানো, এই কাজগুলি করে সুলেমান। কাজেই সুলেমানের সঙ্গে তাঁর একধরনের সখ্য হয়েছে। প্রায়ই দেখা যায় শশাংক পাল আগ্রহ নিয়ে গল্প করছেন সুলেমানের

সঙ্গে। গল্পের ধরাবাঁধা কোনো বিষয়বস্তু নেই। একেকদিন একেকরকম। শশাংক পাল পছন্দ করেন পুরনো দিনের শানশওকতের গল্প করতে। সুলেমানের পছন্দ তার বর্তমান জীবনের গল্প। ভিক্ষুক-জীবনের অভিজ্ঞতার গল্প সে আনন্দের সঙ্গে করে। সে তার ঘোড়ার বুদ্ধিমত্তাতে মুগ্ধ। ইশারা ছাড়াই ঘোড়া যে সব বাড়িতে দাঁড়াচ্ছে এবং গলায় ঘণ্টা নেড়ে উপস্থিতি জানান দিচ্ছে এই গল্প বারবার করেও তার মন ভরে না। ভিক্ষা বিষয়ক গল্প তো আছেই।

বুঝলেন কর্তা, এক বাড়িতে গেলাম। ঘণ্টা বাজাইলাম। ভিতর থাইকা বলল, আইজ না। আইজ বুধবার।

আমি বললাম, বুধবারে বিষয় কী ?

বুধবারে ভিক্ষা দেই না।

দেন না কেন ?

বড়কর্তার নিষেধ।

কোনদিন নিষেধ নাই বলেন, সেই দিন আসব।

মঙ্গলবার।

গেলাম মঙ্গলবার। তখন কী হইছে শুনেন কর্তা। ভিতর থাইকা বলল, আইজ মঙ্গলবার। মঙ্গলবারে আমরা ভিক্ষা দেই না। সোমবারে আসেন।

শশাংক পাল উত্তেজিত গলায় বললেন, বিরাট বজ্জাত তো!

সুলেমান উদাস গলায় বলে, ভিক্ষুকের সঙ্গে মিছা কথা। এখন চিন্তা করেন সমাজ কই গেছে!

সমাজ রসাতলে গেছে।

দু'জনেই সমাজের সাম্প্রতিক রসাতলে প্রবেশে দুঃখিত বোধ করে। তাদের ভেতর এক বিচিত্র সহমর্মিতা দেখা যায়। মাঝে মাঝে গভীর রাতেও তাদের গল্পের আসর বসে। আসরের কথক শশাংক পাল। শুরু হয় তাঁর যৌবনের গল্প—

রায়নার ছোটবাবুর সঙ্গে একবার এক মুজরায় গিয়েছিলাম। রায়নার ছোটবাবু বিরাট জমিদার, সেই তুলনায় আমি নস্যি। মুজরার বাইজির নাম কুন্দন বাই। আহারে, গায়ের কী রঙ, যেন তুষের আগুন! আর কণ্ঠ ? মধু! গানাবাজনা চলছে, আমার মন খারাপ। কিছুতেই মজা পাচ্ছি না।

কেন ?

কুন্দন বাই আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। তার হাসি-তামাশা সবই রায়নার ছোটবাবুর সাথে। তাঁকে নিজের হাতে পান বানিয়ে দিচ্ছে। ফরসীর নল এগিয়ে দিচ্ছে। আমি কেউ না। আমি ছোটবাবুর গোমস্তা।

সুলেমান বলল, আপনার উচিত ছিল উইঠ্যা চাইলা আসা।

শশাংক পাল তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, শোন না ঘটনা। রাত একটার দিকে গানবাজনা কিছু সময়ের জন্যে থামল। রায়নার ছোটবাবু কুন্দন বাইকে একটা আশরাফি নজরানা দিলেন। কুন্দন বাই সালামের পর সালাম দিচ্ছে। আশরাফি পেয়ে তার দিলখোশ। তখন আমি নজরানা দিলাম।

কী দিলেন ?

আমি দিলাম তিনটা আশরাফি।

বলেন কী ?

তখন টাকা ছিল, খরচ করেছি। পরে কী হবে চিন্তা করি নাই। তারপরের ঘটনা শোন— রায়নার ছোটবাবুর মুখ হয়ে গেল ছাইবর্ণ। তার জন্যে বিরাট অপমান। কুন্দন বাই-এর চোখে পলক পড়ে না। আমাকে বলল, বাবুজি আপকা তারিফ ?

তারিফ মানে কী ?

তারিফ মানে নাম। আমার নাম জানতে চাইল। নাম বললাম। পরের ঘটনা না বলাই ভালো। রাতে থেকে গেলাম। মধু মধু।

রায়নার ছোটবাবুর কী হইল ?

উনি বিরাট শিক্ষার মধ্যে পড়লেন। জন্মের শিক্ষা। জুরিগাড়ি নিয়া চলে গেলেন।

সুলেমান বলল, উচিত শিক্ষা হয়েছে। পাছায় লাথি খাইছে।

শশাংক পাল বললেন, জীবন নিয়া আমার কোনো আফসোস নাই, বুঝেছ সুলেমান। মধুদিন কাটিয়েছি। এখন সামান্য বেকায়দায় আছি, তবে বেকায়দা যে-কোনো সময় কাটতে পারে। সুতা ভগবানের হাতে। উনি সুতা কীভাবে টান দিবেন কে জানে। উনার সুতার এক টানে দেবী লক্ষ্মী এসে আমার পাশে বসতে পারেন। পারেন না ?

অবশ্যই পারেন।

দেবী লক্ষ্মীর গল্প শুনবা ?

শুনব।

লক্ষ্মী এবং তার স্বামী নারায়ণ বৈকুণ্ঠে বসে রসালাপ করছিলেন। এমন সময় তাদের সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল সূর্যপুত্র রেবন্ত। লক্ষ্মী তাঁর ঘোড়ার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। সেই ঘোড়া তো আর তোমার ঘোড়ার মতো মরা ঘোড়া না। স্বর্গের ঘোড়া, নাম উচ্চশ্রবা। যাই হোক,

নারায়ণ বললেন, লক্ষ্মী, তুমি চোখ বড় বড় করে কী দেখ ? লক্ষ্মী ঘোড়া দেখে এতই মজেছেন যে উত্তর দিলেন না। নারায়ণের উঠল রাগ। উনি বললেন, ঘোড়া দেখে তুমি মজেছ, তোমাকে অভিশাপ দিলাম। তুমি পৃথিবীতে ঘোড়ী হয়ে জন্মাবে। ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গম করবে এবং তোমার একটা ঘোড়াপুত্র হবে।

সুলেমান বলল, সর্বনাশ!

শশাংক পাল বললেন, দেবদেবীদের কাছে এইসব কোনো ব্যাপার না। তারা অভিশাপ দেওয়ার মধ্যেই থাকেন।

লক্ষ্মী কি ঘোড়া হয়ে জন্মেছিলেন ?

অবশ্যই। তাঁর একটা ঘোড়াপুত্রও হয়েছিল। বিষ্ণুর আশীর্বাদে তার শাপমুক্তি ঘটে। ঘোড়াপুত্র মানুষ হয়। একবীর নামে সে দীর্ঘদিন পৃথিবী শাসন করে। নতুন এক বংশ স্থাপন করে। বংশের নাম 'হৈহয়' বংশ।

আজিব ব্যাপার।

দেবতাদের কাছে আজিব কোনো ব্যাপার নাই। তারা যদি ঘোড়া থেকে মানুষ বানাতে পারেন তাহলে আমাকে দুর্দশা থেকে কেন উদ্ধার করতে পারবেন না ?

সুলেমান দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, অবশ্যই পারবেন।

নিশিরাতে শশাংক পালের সঙ্গে গল্প করতে সুলেমানের ভালো লাগে। জীবন আনন্দময় মনে হয়।

ভিক্ষুক জীবন যে এত সুখের হবে তা সুলেমানের কল্পনাতেও ছিল না। অল্পদিনেই ঘোড়ার পিঠে ঘুমিয়ে পড়ার দুর্লভ বিদ্যাও সে আয়ত্ত করেছে। ঘণ্টা বাজিয়ে হালকা চালে ঘোড়া চলে, সুলেমান লাগাম ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে শোনে— টুনটুন টুনটুন। শান্তির আনন্দযাত্রা।

সুলেমান যতটুকু আনন্দে আছে ঠিক ততটাই কষ্টে আছেন মাওলানা ইদরিস। তিনি কষ্টে আছেন দুঃস্বপ্ন দেখে। দুঃস্বপ্নটা তিনি এই নিয়ে তিনবার দেখেছেন। একই স্বপ্ন— ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখা। স্বপ্নে হরিচরণ এসে তাকে ডাকেন। মাওলানা আছ ? মাওলানা! মাওলানা ব্যস্ত হয়ে বের হন। তখন হরিচরণ বলেন, কাজটা কি ঠিক করেছ মাওলনা ? আমি মুসলমান হই নাই। তুমি জানাযা পড়িয়ে আমাকে কবর দিয়ে দিলে। আমাকে দাহ করা উচিত ছিল না ?

প্রতিবারই মাওলানা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চান। কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন, ধনু শেখ যেটা বলেছেন আমি সেটাই বিশ্বাস করেছি। আমি ভেবেছি মৃত্যুর আগে আপনি মুসলমান হয়েছেন।

হরিচরণ বলেন, উঁহু! তুমি বিশ্বাস কর নাই। তুমি আমার লেখা দানপত্রে দস্তখত করেছ। তুমি বিশ্বাস করবে কেন ? তুমি কাজটা করেছ ভয়ে। আমাকে মাটিচাপা দিয়েছ।

এখন কী করব সেটা বলে দেন।

আমার লাশটা কবর থেকে তোল। তারপর দাহ করার ব্যবস্থা কর। মুখাগ্নি তুমিই করবে।

আমি কী করে মুখাগ্নি করব ? আমি মাওলানা মানুষ!

জহিরকে খবর দাও। সে আমার পুত্রসম। পুত্রই মুখাগ্নি করে।

তাকে কই পাব বলেন! সে নিরুদ্দেশ হয়েছে। কেউ তার খোঁজ জানে না।

খোঁজ বের কর। বেশি দেরি করলে মহাবিপদে পড়বা।

কী বিপদ ?

আমি নিজেই কবর থেকে বের হয়ে পড়ব। তখন বিরাট বিশৃঙ্খলা হবে।

কী বিশৃঙ্খলা ?

বের হই, তারপর দেখ কী বিশৃঙ্খলা।

এই পর্যায়ে আতঙ্কে মাওলানার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি জেগে উঠে দেখেন তার বুক ধড়ফড় করছে। সারা শরীর ঘামে ভেজা। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম।

স্বপ্নের বিষয়ে তিনি খান সাহেব ধনু শেখের সঙ্গে আলাপ করলেন। ধনু শেখ অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি। লোকজন সবসময় তাকে ঘিরে রাখে। সরাসরি তিনি এখন কারো সঙ্গে কথাও বলেন না। আগে তাঁর মুনসির সঙ্গে কথা বলতে হয়। মুনসির অনুমতি পেলে তবেই খান সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত।

খান সাহেব মাওলানার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেন। মন দিয়ে স্বপ্ন শুনলেন। তারপর দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, স্বপ্ন নিয়া তুমি চিন্তিত ? (খান সাহেব কিছুদিন হলো দাড়ি রেখেছেন। দাড়িতে চেহারার ত্রুটি অনেকটাই ঢাকা পড়েছে।)

জি জনাব।

ভালো জিনিস নিয়া চিন্তা করা শিখো। স্বপ্ন কি কোনো বিষয় ?

স্বপ্নটা কয়েকবার দেখলাম। এই কারণে মন অস্থির।

মাত্র কয়েকবার ? একটা স্বপ্ন আমি এই নিয়া একশ'বার দেখেছি। স্বপ্নে আমি গেছি ছোটলাট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে। খান বাহাদুর টাইটেল

দেয়া হবে। আমার খান বাহাদুর টাইটেল পাওয়ার কথা। সেখানে আরো অনেক বিশিষ্টজনরা আছেন। অতি মনোহর তাদের পোশাক। একমাত্র আমার শরীরে কোনো কাপড়-চোপড় নাই। পুরা নেংটা। একটা সুতাও নাই। ছোটলাট এই অবস্থাতেই আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। তুমি বলো, খারাপ স্বপ্ন না ?

জি।

এই স্বপ্ন আমি একশ'বার দেখেছি, তাতে কী হয়েছে ? নাকি তুমি ভাবতেছ হরিচরণ মৃত্যুর আগে কলেমা তৈয়ব বলে মুসলমান হয় নাই ? আমি সবেরে মিথ্যা বানিয়ে বলেছি। একজন হিন্দুরে মুসলমান পরিচয় দিয়া কবর দেওয়ার মধ্যে আমার কোনো ফয়দা আছে ? চুপ করে থাকবা না। বলো ফয়দা আছে ?

জি-না। স্বপ্নের তফসির জানলে মনের অস্থিরতা কমত। আল্লাহপাক স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের অনেক কিছু জানান দেন।

খান সাহেব বললেন, তফসির জানতে চাইলে জানো। বিশিষ্ট আলেমদের কাছে যাও। রাহাখরচ যদি চাও আমার দিতে আপত্তি নাই। মুনসির কাছে দস্তখত দিয়া কুড়ি টাকা রাহাখরচ নেও।

মাওলানা বললেন, আপনার মেহেরবানি।

আমি যেন খান বাহাদুর টাইটেল পাই এই জন্যে দোয়াখায়ের সর্বক্ষণ করবা। অঞ্চলে একজন খান বাহাদুর থাকলে সবের লাভ। এতে অঞ্চলের ইজ্জত বাড়ে। বুঝেছ ?

জি।

তোমার বৃত্তি এই মাস থেকে পাঁচ টাকা বাড়াইলাম। আমি দরাজ হাতের লোক। সাল্লার নেয়ামত হোসেনের মতো 'কিরপিন' না। নেয়ামত হোসেন কী করেছে শুনেছ ?

জি-না।

লখনৌ-এর যে বাইজি নিয়া আসছিল তারে ফালায়া থুইয়া ভাগছে। সেই মেয়েরে যেসব গয়না দিয়েছিল তাও শুনছি নিয়া গেছে। মেয়ের না আছে টাকা পয়সা, না আছে কিছু। খাওয়া খাদ্যের ব্যবস্থাও করে নাই। বাধ্য হয়ে আমি ব্যবস্থা নিয়েছি।

ভালো করেছেন।

খান সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, কেউ বিপদে পড়লে তার জন্যে কিছু না করা পর্যন্ত অস্থির থাকি। এইটাই আমার সমস্যা।

লখনৌ-এর বাইজি পিয়ারীকে খান সাহেব ময়মনসিংহে ঘর ভাড়া করে রেখেছেন। পিয়ারীর সঙ্গে আছে তবলচি এবং সারেঙ্গিবাদক। তাদের রান্নাবান্নার জন্যে একজন বাবুর্চি আছে। দেখাশোনার জন্যে দারোয়ান আছে।

খান সাহেবকে কাজেকর্মে প্রায়ই ময়মনসিংহ যেতে হয়। তিনি পিয়ারীর ভাড়া বাড়িতে উঠেন। অনেক রাত পর্যন্ত গানবাজনা হয়। পিয়ারীর সঙ্গ তাঁর বড় মধুর মনে হয়। রাতে সুনিদ্রা হয়। মাঝে মাঝে লাটসাহেবকে দেখা স্বপ্নটা তাঁকে বিরক্ত করে।

দেওবন্দের আলেমরা মাওলানা ইদরিসের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না। তবে দেওবন্দ যাওয়ায় মাওলানার একটা লাভ হলো, তিনি 'হাফেজ' টাইটেল পেয়ে গেলেন। নির্ভুল কোরান পাঠ করলেন। তাঁর ইচ্ছা করল তিনি দেওবন্দে থেকে যাবেন। আলেমদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করে জীবন কেটে যাবে। বান্ধবপুরে ফিরে যাওয়া মানেই স্বপ্নে হরিচরণের সঙ্গে সাক্ষাত। এছাড়া রঙিলাবাড়ির বিষয়ও আছে। রঙিলাবাড়ির বিষয় তিনি চিন্তাও করতে চান না। তারপরেও হঠাৎ হঠাৎ চিন্তাটা আসে, তখন বড়ই অস্থির লাগে। শান্তির জীবন আল্লাহপাক তাকে দেন নাই। আল্লাহপাক দিয়েছেন ধারাবাহিক দুঃশ্চিন্তার জীবন।

হাফেজ মাওলানা ইদরিস বান্ধবপুরে ফিরেছেন। এখন আর কেউ তাঁকে মাওলানা ডাকছে না। সবই বলছে 'হাফেজ সাব'। সম্বোধনই বলে দিচ্ছে এই লোক কোরান মজিদ কণ্ঠস্থ করেছেন। ইনি সহজ কেউ না। শুনতে আনন্দ লাগছে। আনন্দের সঙ্গে গভীর শঙ্কাও জড়িত। মাওলানা জানেন ইবলিশ শয়তান এখন সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গে থাকবে। তাঁকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করবে। একজন সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেয়ে কোরানে হাফেজকে বিভ্রান্ত করায় অনেক লাভ। ইবলিশ প্রাণপণে চেষ্টা করে যাবে তাঁকে দিয়ে মিথ্যা বলাতে। পাপ চিন্তা করাতে। পাপ কাজে যেমন গুনাহ্, পাপ চিন্তাতেও একইরকম গুনাহ্।

ইবলিশ যে এই বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসরও হয়েছে সেটাও তিনি বুঝতে পারছেন। কয়েকদিন আগে এশার নামাজ শেষ করে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো বাড়িতে ঢুকেই দেখবেন জুলেখা উঠানে বসে আছে। (চিন্তাটা অবশ্যই ইবলিশ শয়তান তাঁর মাথায় ঢুকিয়েছে। তিনি নিজে কখনো এ ধরনের নাপাকি চিন্তা করবেন না। আস্তাগফিরুল্লাহ।)

চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে মাথা থেকে দূর করে দেয়া প্রয়োজন, তা না করে তিনি চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলেন (আবারো ইবলিশের কাজ)। তিনি কল্পনা করেই যেতে

লাগলেন। কী ঘটছে তিনি চোখের সামনে দেখতেও পাচ্ছেন— এই তিনি উঠানে পা দিলেন। জুলেখা জলচৌকিতে বসেছিল। পরনে শাড়ি। মাথায় ঘোমটা নেই। মাথাভর্তি চুল। তাঁকে দেখে লজ্জা পেয়ে জুলেখা উঠে দাঁড়াল।

তিনি বললেন, এখানে কী চাও ? তোমাকে না বলেছি এ বাড়িতে আসবে না ? আবার কেন আসছ ?

আপনাকে দেখার জন্যে আসছি।

কেন ?

আমি যত মন্দই হই, আপনি আমার স্বামী।

এরকম নাপাকি কথা বলবা না।

আমি নাপাক, কিন্তু আপনি আমার স্বামী— এর মধ্যে নাপাকি কী ? আমি তওবা করব। তওবা করে আপনার সঙ্গে সংসার করব।

চুপ।

ধমক দিয়েন না। অজুর পানি দেন। আমি অজু করে তওবা করব। বাকিজীবন বোরকা পরে থাকব। কেউ জানবে না আমি কে!

এইখানে থাকলেই জানাজানি হবে।

তাইলে চলেন নাও নিয়া দূরে চইলা যাই। ভাটি অঞ্চলে যাইবেন ? ভাটির শেষ সীমায় ?

চুপ করবা ?

না, চুপ করব না।

উঠানে পা দিয়ে মাওলানার চিন্তা বন্ধ হলো। উঠানে কেউ নেই। জলচৌকি শূন্য। তাঁর মনটা খারাপ হলো। সব শয়তানের খেলা। মাওলানা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। রাতে গোসল করে পবিত্র হলেন। শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্যে তিনবার সূরা ইয়াসিন পাঠ করলেন। মন পবিত্র করার জন্যে এরচে' ভালো সূরা নাই।

তাঁর মন ততটা পবিত্র হলো না। রাতে খেতে বসার সময় মনে হলো— জুলেখাকে ভাত খাইয়ে দেয়া উচিত ছিল। না খাইয়ে তাকে বিদায় করেছেন, কাজটা ঠিক হয় নাই। আজকে আয়োজনও ভালো ছিল। কাঁঠালের বিচি দিয়ে মুরগির সালুন। হাফেজ সাহেবের জন্যে রান্না করে কেউ একজন পাঠিয়েছে। আজ ডালটাও ভালো হয়েছে। আমচূর দিয়ে টক ডাল, এর স্বাদই অন্যরকম। মেয়েরা টক পছন্দ করে।

মাওলানার একবারও মনে হলো না— জুলেখা এ বাড়িতে আসে নি। পুরোটাই তাঁর কল্পনা। কিংবা তাঁর ভাষায়— শয়তানের জটিল খেলা। মাওলানার মস্তিষ্ক বিকৃতির সেটাই শুরু।

ফজরের নামাজ পড়ার জন্যে ঘুম ভাঙতেই মাওলানা শুনলেন পাশের ঘর থেকে জুলেখা মধুর স্বরে কোরান আবৃত্তি করছে। তিনি বললেন, জুলেখা, নিচু গলায় পড়। পরপুরুষ তোমার কণ্ঠস্বর শুনবে, এইটা ঠিক না।

জুলেখা বলল, জঙ্গলার মধ্যে বাড়ি। আপনি ছাড়া এইখানে তো কেউ নাই।

মাওলানা বললেন, এইটাও যুক্তির কথা। তারপরেও নিচু গলায় পড়া ভালো। ধর, জঙ্গলে কেউ লাকড়ির সন্ধানে যদি আসে। কিংবা হারানো গরু যদি খুঁজতে খুঁজতে আসে।

জুলেখা মনে হয় যুক্তি মেনেছে। এখন তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ।

রঙিলাবাড়ির ঘাটে মাঝারি আকৃতির বজরা এসে থেমেছে। বজরায় আছেন মোহনগঞ্জের বাম গ্রামের শৈলজারঞ্জন মজুমদার। রসায়নশাস্ত্রে M.Sc করা দারুণ পড়ুয়া মানুষ। তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ডাক পেয়েছেন। শান্তিনিকেতনের বিজ্ঞান ভবনে যোগ দেবার চিঠি। মানুষটা গানপাগল। চান বিবি নামের অতি সুকণ্ঠী গায়িকার খবর পেয়ে এসেছেন। রঙিলাবাড়িতে উপস্থিত হতে তাঁর রুচিতে বাঁধছে। তিনি চান বিবিকে খবর পাঠিয়েছেন। যদি সে বজরায় এসে কয়েকটা গান শোনায়। অপ্রচলিত গান সংগ্রহেও তাঁর ঝোঁক আছে। বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময় (শ্রাবণ মাস এবং ভাদ্র মাস) নৌকায় ঘুরে ঘুরে গান সংগ্রহের বাতিকও তাঁর আছে। তিনি শুধু যে গান লিখে রাখেন তা না, গানের সুরও আকার মাত্রিক স্বরলিপিতে লিখে ফেলেন। স্বরলিপি লেখার বিষয়ে তাঁর দক্ষতা আছে।

চান বিবি সন্ধ্যাবেলায় বজরায় উপস্থিত হলো। তার সঙ্গে দুজন দাসি। একজনের হাতে কার্পেটের আসন। অন্যজনের হাতে রূপার পানদানিতে সাজানো পান। চান বিবি কার্পেটের আসনে বসতে বসতে বলল, কী গান শুনবেন গো ?

শৈলজারঞ্জন মজুমদার বললেন, তুমি তোমার পছন্দের গান কর।

চান বিবি বলল, আমার পছন্দের গান আমি করি আমার জন্য। আপনের জন্য কেন করব ?

শৈলজারঞ্জন বললেন, সেটাও তো কথা। তোমার যে গান গাইতে ইচ্ছা করে গাও।

ধামাইল শুনবেন ?

শুনব।

নাকি আমিন পাশার পাগলা গান শুনবেন।

পাগলা গান কী ?

পদে পদে তালফেরতা মজা আছে।

তোমার সঙ্গে তো তবলা নেই। তাল আসবে কোত্থেকে।

আমার গলায় তাল আছে।

শৈলজারঞ্জন তিনটি গান শুনেই বললেন, আর লাগবে না। চান বিবি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমার গান কি আপনার পছন্দ হয় নাই ?

পছন্দ হয়েছে। কিন্তু আর শুনব না। আমি অতি বিখ্যাত একজন মানুষকে তোমার গান শোনার ব্যবস্থা করে দেব। উনাকে গান শুনিও। উনি যদি খুশি হন তাহলে তোমার মানবজন্ম ধন্য হবে।

চান বিবি অবাক হয়ে বলল, এই মানুষ কে ?

শৈলজারঞ্জন বললেন, উনি বাংলাগানের রাজার রাজা। তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তুমি নিশ্চয়ই তার গান কখনো শোন নি ?

আমি উনাকে চিনেছি। উনার গানরে বলে রবিবাবুর গান। একটা গানের সুর পরিষ্কার মনে আছে। কথা মনে নাই। এক দুই পদ মনে আসে।

শৈলজারঞ্জন অবাক হয়ে বললেন, এক দুই পদ শোনাও তো।

চান বিবি শুদ্ধ সুরে গাইল—

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে—
নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে।

শৈলজারঞ্জন আগ্রহের সঙ্গে বললেন, আমি গানটা ঠিক করে লিখে দেই ? তুমি ভালোমতো শিখে রাখ। সত্যি যদি কোনোদিন সুযোগ হয় রবীন্দ্রনাথকে গানটা শোনাবে।

চান বিবি হ্যাঁ-সূচক ঘাড় কাত করল।

মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীর নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছেন ময়মনসিংহে। তিনদিন থাকবেন। শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের উপর কয়েকটা বক্তৃতা দেবেন। ময়মনসিংহের ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে থিয়েটার দেখবেন। তার জন্যে পাখি শিকারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। তিনি শিকার পছন্দ

করেন না বলে সেই প্রোগ্রাম বাতিল করা হয়েছে। তার বদলে ব্রহ্মপুত্র নদে বিহার এবং সঙ্গীতানুষ্ঠান।

রবীন্দ্রনাথ ময়মনসিংহে পৌছে জমিদারদের টানাটানিতে পড়ে গেলেন। কোথায় রাত কাটাবেন এই নিয়েও সমস্যা। শশীকান্ত আচার্য চাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ থাকবেন তাঁর বাড়ি 'শশীলজ'-এ। গৌরীপুরের মহারাজা ব্রজেন্দ্র রায়চৌধুরী চাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ রাত কাটাবেন 'গৌরীপুর লজ'-এ। তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি এই দোতলা বাড়ি কবিগুরুর পছন্দ হবে। বাড়িটা তিনি চীনা মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি করেছেন। সুদূর বার্মা থেকে আনা হয়েছে সেগুন কাঠ। এদিকে মুক্তাগাছার আরেক জমিদার রাজা জগত কিশোর আচার্য চাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ থাকবেন তাঁর নতুন বাড়ি 'আলেকজান্দ্রা ক্যাসেল'-এ।

তিনদিনের ক্লান্তিকর ময়মনসিংহ ভ্রমণের শেষে রবীন্দ্রনাথ চলে এলেন কেন্দুয়ার আঠারোবাড়িতে। আঠারোবাড়ির জমিদার বাবু প্রমোদ রায়চৌধুরী মহাসমাদরে তাঁকে নিয়ে এলেন। যে বাড়িতে তাঁকে রাখা হলো সেই বাড়িটা কাঠের। বাড়ির দোতলায় বিশাল বারান্দা। বারান্দায় কবির জন্যে আরামদায়ক কেদারা পাতা। ভ্রমণে ক্লান্ত কবি আরাম কেদারায় শুয়ে সারা সন্ধ্যা বাংলাদেশের ঘন বর্ষণ দেখলেন। রাতে গান রচনা করলেন—

আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে
জানি নে, জানি নে কিছুতে কেন যে মন লাগে না ॥
এই চঞ্চল সজল পবন-বেগে উদ্‌ভ্রান্ত মেঘে মন চায়
মন চায় ওই বলাকার পথখানি নিতে চিনে ॥
মেঘমল্লারে সারা দিনমান
বাজে ঝরনার গান।
মন হারাবার আজি বেলা, পথ ভুলিবার খেলা— মন চায়
মন চায় হৃদয় জড়াতে কার চিরঋণে ॥

কবিকে আনন্দ দেবার জন্যে নৈশভোজের পর গানবাজনার আয়োজন করা হলো। একজন বংশীবাদক বাঁশি বাজাল। কবি মন দিয়ে শুনলেন না। হাই তুলতে তুলতে বললেন, শরীরটা ক্লান্ত লাগছে। আজ শুয়ে পড়ি।

মহারাজা বললেন, অবশ্যই। শোবার আগে একটা গান কি শুনবেন ? আপনার রচিত গান। সুকণ্ঠী গায়িকা। মনে হয় আপনার ভালো লাগবে। বাবু শৈলজারঞ্জন মজুমদার আমাকে পত্র দিয়ে এই গায়িকার কথা বলেছেন। তাকে পালকি করে আনিয়েছি। অবশ্য সামান্য কিন্তু আছে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, কিন্তু আছে মানে কী ?

মেয়েটির বাস ভদ্রঘরে না। তার বাস পঙ্কে।

পঙ্কে বাস তো পদ্ম'র। শুনি পদ্ম'র গান।

মহারাজা ইশারা করতেই পর্দার আড়াল থেকে জুলেখা বের হলো। জড়সড় হয়ে বসল পায়ের কাছে। মহারাজা বললেন, এর উচ্চারণ শুদ্ধ হবে না, কিন্তু কণ্ঠ মধুর।

জুলেখা খালি গলায় গাইল, চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে—

কবি চোখ বন্ধ করে গান শুনলেন। গান শেষ হবার পর চোখ মেলে বললেন, কণ্ঠের মাধুর্যে উচ্চারণের ত্রুটি ঢাকা পড়েছে। তোমার নাম কী?

জুলেখা বিড়বিড় করে বলল, চান বিবি।

তুমি তাহলে চন্দ্রের স্ত্রী? ভালো তো। তুমি শান্তিনিকেতনে আসবে? গান শিখবে?

কোনোকিছু না বুঝেই জুলেখা ঘাড় কাত করল। রবীন্দ্রনাথ মহারাজার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার এই গান পূজাপর্বের। কিন্তু মেয়েটির গলায় গানটা শোনার পর মনে হচ্ছে গানটা প্রেমের। মানব-মানবীর প্রেম। কথা শেষ করেই তিনি জুলেখার দিকে তাকিয়ে বললেন, চন্দ্র-স্ত্রী, কাছে এসো, আশীর্বাদ করে দেই।

জুলেখা এগিয়ে এলো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মাথায় হাত রাখলেন।

জুলেখা কি টের পেল যে আজ তার পঙ্কের জীবন ধন্য হলো?*

১৯২৬ ইংরেজি।

* গানের উপর অসাধারণ দখল দেখে শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজ্ঞান ভবন থেকে কলা ভবনে নিয়ে আসেন। শৈলজারঞ্জনের প্রধান কাজ হয় রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি তৈরি করা। —লেখক

'বঙ্গবাসী' কাগজের শিরোনাম—

দুর্ধর্ষ বিপ্লবী জীবনলালের পলায়ন।

ঘটনার বিবরণে বলা হচ্ছে, আলীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে বন্দি স্থানান্তরের সময় জীবনলাল হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় পলায়ন করেন। ওঁৎ পেতে থাকা বিপ্লবীরা পুলিশের গাড়িতে বোমাবর্ষণ করলে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন জীবনলাল।

'ময়মনসিংহ গেজেট' পত্রিকার শিরোনাম—

খান সাহেব ধনু শেখ মুসলিম লীগের
ময়মনসিংহ জেলার আহ্বায়ক নির্বাচিত।

দুই পত্রিকায় দুইজনের ছবি। ধনু শেখের মাথায় তুর্কি ফেজ টুপি। গায়ে আচকান। জীবনলালের ছবিতে ফুল হাতা গেঞ্জি পরা এক যুবক, যার চেহারায় লজ্জাভাব প্রবল। ক্যামেরায় ছবি তোলা হচ্ছে এই কারণে সে বিব্রত।

এই দুই পত্রিকার কোনোটিতেই তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লীর এক যুবকের ছবি বা খবর ছাপা হয় নি। যুবকের নাম চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন। তিনি ১৯৩০ সনে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁর আপন ছোটভাইয়ের ছেলে সুব্রামনিয়াম চন্দ্রশেখরও পঞ্চাশ বছর পর ১৯৮৩ সনে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। ভারতীয় পত্রিকাগুলি এই খবর ছাপাতেও কেন জানি ভুলে গিয়েছিল।

বান্ধবপুর পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার নিয়ে চিন্তিত না। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার সমস্যা নিয়ে চিন্তিত না। গান্ধীজি হঠাৎ করেই অসহযোগ আন্দোলন কেন ভেঙে দিলেন তা নিয়েও চিন্তিত না। বান্ধবপুর চিন্তিত তার মানুষজন নিয়ে। মাওলানা ইদরিসকে নিয়ে। মানুষটার হয়েছে কী? এই রোগের কি কোনো চিকিৎসা আছে? তাকে ধরে বেঁধে একটা বিয়ে দিয়ে দিলে কেমন হয়?

জঙ্গলে অমাবস্যা তিথিতে হো হো শব্দ কেন হয় তা নিয়ে বান্ধবপুর চিন্তিত। ভূতপ্রেতের বিষয় বোঝা যাচ্ছে। কঙ্কাটারা এমন শব্দ করে। কঙ্কাটা যতক্ষণ জঙ্গলে থাকবে ততক্ষণ ঠিক আছে, কিন্তু পাড়ায় ঢুকলে সমূহ বিপদ।

কবিরাজ সতীশ পরিবারের মেয়ে যমুনাকে নিয়ে বান্ধবপুর চিন্তিত। সালিশ বসা উচিত। এখনো বসছে না কেন ? সালিশে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে, ঘটনা কে ঘটিয়েছে ? হিন্দু না মুসলমান ? ডাকাতদল যেহেতু যুক্ত, মুসলমান হবার সম্ভাবনাই বেশি। ডাকাতি বেশিরভাগ মুসলমানরাই করে।

ভারতীয় এক বিজ্ঞানী সমুদ্রের পানির রঙ নীল দেখায় কেন তা বের করে ফেলেছেন, এটা কি কোনো বিষয়! ঈশ্বর ঠিক করে রেখেছেন সমুদ্রের পানি নীল দেখাবে, এই কি যথেষ্ট না ?

হাফেজ মাওলানা ইদরিসের মাথা যে পুরোপুরি গেছে এই বিষয়ে বান্ধবপুরের মানুষদের মনে এখন আর কোনো সংশয় নেই। বান্ধবপুরের মতো এতবড় অঞ্চলে একজন 'আউলা' মাথা থাকবে না, এটাই বা কেমন কথা ? গ্রামে এক দুইজন 'আউলা' মাথা থাকা ভালো, এতে গ্রামের উন্নতি। বদ্ধ উন্মাদ হলে ভিন্ন কথা। বদ্ধ উন্মাদকে নৌকায় করে দূরের কোনো গঞ্জে গোপনে ছেড়ে আসাটা বিধি। মাওলানা ইদরিস বদ্ধ উন্মাদ না। তিনি একটা বিষয় ছাড়া সর্ব বিষয়ে অতি স্বাভাবিক। মসজিদের নামাজ নিয়মমতো পড়াচ্ছেন। জুম্মাবারে একটা হাদিস বয়ান করা এবং তার ব্যাখ্যা করা তাঁর অনেকদিনের অভ্যাস। এই অভ্যাসেরও পরিবর্তন হয় নি। গত জুম্মাবারে তিনি নবিজির হাদিস বয়ান করলেন।

মুসুল্লিদের আজ যে হাদিসটা বলব এই হাদিস আমরা পেয়েছি ইয়াজিদের কন্যা বিবি আসমার কাছ থেকে। তিনি বলছেন, একদিন নবিজি (সাল্লালালাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে খাবার আনা হয়েছে। তিনি সেই খাবার আমার এবং আমার সঙ্গে উপস্থিত কিছু মহিলার সামনে রেখে বললেন, খাও। আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম ক্ষুধার্ত, তারপরেও ভদ্রতা করে বললাম, আমাদের ক্ষুধা নাই। তখন নবিজি বললেন, "হে মহিলাবৃন্দ! ক্ষুধার সঙ্গে মিথ্যা মিশিও না।"

এখন মুসল্লিগণ এই হাদিসের ব্যাখ্যা চিন্তা করেন। ব্যাখ্যা হলো, ভদ্রতার কারণে মিথ্যা বলা যাবে না। যেই মিথ্যায় ক্ষতি নাই সেই মিথ্যাও বলা যাবে না। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা বলা যাবে না। সবাই বলেন— আলহামদুলিল্লাহ।

সবাই আলহামদুলিল্লাহ বলল। মাওলানা দোয়া শুরু করলেন। কোথাও ভুল নেই। কোনো ভ্রান্তি নেই। শুধু এক জায়গাতেই সমস্যা। মাওলানার ধারণা ঘরে তাঁর স্ত্রী আছে। অতি রূপবতী স্ত্রী।

বাড়িতে ঢোকার আগে উঠানে দাঁড়িয়েই তিনি কয়েকবার গলা খাঁকারি দেন। যেন তাঁর স্ত্রী গায়ের কাপড় বেশামাল থাকলে ঠিকঠাক করে নিতে পারেন। স্ত্রীকে স্বামীর সামনেও আব্রু রক্ষা করার বিধান।

বাড়িতে ঢুকে পাগড়ি খুলতে খুলতে মাওলানা বলেন, বউ, রান্না কিছু হয়েছে ?

তাঁর প্রশ্নের কেউ জবাব দেয় না। কিন্তু মাওলানা জবাব শুনতে পান এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলেন, থাক থাক, জ্বর গায়ে নিয়ে এখন রান্না করতে বসতে হবে না। সামান্য চাল-ডাল আমি নিজেই ফুটিয়ে নিতে পারব। তুমি বরং কিছুক্ষণ শুয়ে থাক। গোসল করবে ? পানি এনে দেব ? তাহলে থাক গোসলের দরকার নাই। জ্বর সারুক। বউ, আমার কিন্তু ধারণা তোমার ম্যালেরিয়া হয়েছে। প্রতিদিন একই সময় জ্বর, এইটা ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছু না। আমাকে মনে করিয়ে দিও, সতীশ কবিরাজের কাছ থেকে মিকচার এনে দিব। পাঁচ দাগ মিকচার খেলেই জ্বর শেষ। খেতে তিতা। নিষিন্দার রসের চেয়েও তিতা। কিন্তু ম্যালেরিয়ার যম।

মাওলানা বারান্দায় রান্না করতে বসেন। চোঙা দিয়ে চুলায় ফুঁ দিতে দিতে পরিষ্কার শুনতে পান উঠান ঝাট দেয়া হচ্ছে। পাতা জমানো হচ্ছে। মাওলানা দুঃখিত গলায় বললন, বউ, তুমি দেখি আমার কোনো কথাই শুন না। শরীরে জ্বর নিয়া উঠান ঝাঁট দিতে শুরু করলা। কয়েকটা শুকনা পাতা পইড়া আছে, এতে হইছে কী ? বন কর।

ঝাড় দেয়ার শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। মাওলানা বড়ই আনন্দ পান।

হাটের দিনে মাওলানাকে তাঁর অদৃশ্য স্ত্রীর জন্যে টুকটাক অনেক কিছু কিনতে দেখা যায়। সস্তার জিনিস— কাঁচের চুড়ি, ফিতা, কাঠের কাঁকই। দোকানিরা এই সময় তাঁর সঙ্গে নানান রহস্য করে। তিনি সেই রহস্যের কিছুই বোঝেন না। তাদের কথার জবাব দিয়ে যান। স্ত্রী প্রসঙ্গে কথা বলতে তাঁর ভালো লাগে।

মাওলানা সাব, কাঁচের চুড়ি যে কিনতেছেন ভাবি সাবের হাতের মাপ দরকার না ?

এই মাপেই চলবে। মাপ আমি জানি।

সবুজ চুড়ি কিনলেন, ভাবি সাবের গায়ের রঙ কী ? গায়ের রঙ শাদা না হইলে চুড়ি ফুটব না।

গাত্রবর্ণ অতি পরিষ্কার।

মাশাল্লাহ।

নতুন এক সাবান বাইর হইছে কোম্পানির, জলে ভাসা সাবান। পুসকুনিতে ছাইড়া দিবেন পানিতে ভাসতে থাকব। ভাবি সাবের জন্যে সাবান একটা দিব ?

না। সে পুকুরে স্নান করে না।

পুকুরে স্নান করতে সমস্যা কী ?

সমস্যা আছে। পর্দার সমস্যা। চাইর দিক খোলা।

সেইটাও তো একটা কথা।

মাওলানাকে নিয়ে নানান আমোদ হয়। বান্ধবপুরের লোকজন আমোদ করে। পরিচিতজনরা করে। অপরিচিতজনরাও করে। সবচে' বেশি আমোদ করেন ধনু শেখ। আজকাল তাঁর সময়ের খুব অভাব। নানান মিটিং করতে হয়। সভা সমিতিতে যেতে হয়। ময়মনসিংহ শহরে নিজের থাকার জন্যে তিনি বাড়ি বানিয়েছেন। বাড়ির নাম 'খান ভিলা'। বান্ধবপুরে মাসে এক দুই বারের বেশি আসতে পারেন না। যখনই আসেন মাওলানাকে ডেকে পাঠান। ধনু শেখের সময়টা ভালো কাটে।

মাওলানা, তোমার স্ত্রী আছে কেমন ?

জি জনাব ভালো। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

গতবারে তোমার কাছে শুনেছিলাম উনার ম্যালেরিয়া হয়েছে।

জি। সতীশ কবিরাজের কাছ থেকে এনে ওষুধ খাইয়েছি। এতে আরাম হয়েছে।

এখন আর জ্বর আসে না ?

জি-না। আল্লাপাকের মেহেরবানি।

এখন পর্যন্ত কেউ উনারে চউক্ষে দেখল না, এইটা কেমন কথা ?

পর্দা-পুসিদার মধ্যে থাকে।

স্ত্রীলোকের সামনেও কি পর্দা করে ?

জি।

ভালো তো। খুবই ভালো। তা তোমাদের সন্তানাদি কিছু হবে ? আছে কোনো খবর ?

এখনো খবর নাই।

খবর হইলে আগেভাগে বলবা। নয়তো একদিন হঠাৎ শুনব তোমার সন্তান হয়েছে, তারেও কেউ চোখে দেখে না।

খবর হইলে আপনারে জানাব।

তোমার স্ত্রীর নাম তো জুলেখা। নাম ঠিক বলেছি না ?

জি।

সে রঙিলা নটিবাড়ির জুলেখা না তো ?

জি-না। তওবা। আপনি কী বলেন!

না হইলেই ভালো। মাওলানা হইয়া নটি বিবাহ করলে লোকজন তোমার পেছনে দাঁড়ায়া নামাজ পড়বে না। ঠিক না ?

জি ঠিক।

রঙিলাবাড়ির জুলেখার খবর কিছু রাখ ? শুনেছি সে নাকি কলিকাতায় থাকে। তার গানের থাল বাইর হইছে। দুইটাকা কইরা থালের দাম।

আমি কিছু জানি না।

না জানাই ভালো। তুমি স্ত্রীকে নিয়া আছ ভালোই আছ। ভালো কথা, তোমার কি স্ত্রীর সাথে ঝগড়া বিবাদ হয় ?

হয় না।

দুইজন মানুষ একসাথে বাস করতেছ, কিছু ঝগড়া তো হওয়ার কথা। ধমক ধামক কোনোদিনও দেও নাই ?

একবার দিয়েছিলাম, শুরু করল কান্দন। কান্দন দেইখা মন খারাপ হয়েছিল বিধায় ঠিক করেছি আর ধমক ধামক না।

তোমার স্ত্রীর মতো স্ত্রী সবের প্রয়োজন। এই রকম স্ত্রী জনপ্রতি দশবারোটা থাকলেও ক্ষতি নাই। শোন মাওলানা, তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়া একবার আমার ময়মনসিংহের বাড়িতে আস। কী বাড়ি বানাইলাম দেইখা যাও। বাড়িতে ফুঁ দিয়া যাও। স্ত্রী পর্দার মধ্যে থাকবে, অসুবিধা কী ? বোরকা পইরা যাবে। বোরকা পইরা ফিরবে।

জি আচ্ছা যাব।

ধনু শেখের ময়মনসিংহের বাড়িতে মাওলানার যাওয়া না হলেও অন্য এক অতিথি হঠাৎ রাতদুপুরে উপস্থিত। মাঘ মাস। শীত পড়েছে জব্বর। সেই সঙ্গে কুয়াশা, এক হাত দূরের মানুষ দেখা যায় না এমন অবস্থা। ধনু শেখ রাতের খাবার শেষ করেছেন। পানের জন্যে অপেক্ষা করছেন। জর্দা দিয়ে পান খেতে খেতে হুঁকো টানবেন। বাবুর্চি ছগীর পায়ে গরম তেল মালিশ করে দিবে। শরীর ভালো বোধ করলে পিয়ারীকে খবর দিয়ে আনবেন। কিছু গানবাজনা হবে। ইদানীং রাত জেগে দীর্ঘসময় গান শুনতে পারেন না। ঘুমিয়ে পড়েন। গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যেও আনন্দ আছে। ধনু শেখ পিয়ারীকে আনতে পাঠাবেন কি

পাঠাবেন না তা নিয়ে আরামদায়ক অনিশ্চয়তায় আছেন। এই সময় অতিথি শোবার ঘরেই ঢুকে পড়ল। অতিথির মাথায় মাফলার। গায়ে ছাই রঙের চাদর।

ধনু শেখ চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও চুপ করে গেলেন। অতিথি অপরিচিত না। মাফলারে অতিথির মুখ প্রায় ঢাকা। তারপরেও তাকে চেনা যাচ্ছে। অতিথির নাম জীবনলাল। এই লোকের ফাঁসি হয়ে যাবার কথা। সে এখানে কী করছে? বাড়িতে দারোয়ান আছে। সে ঢুকলইবা কীভাবে? ধনু শেখের স্ত্রীদের কেউই এ বাড়িতে নেই। খানসামা এবং বাবুর্চি নিয়ে সংসার। বাবুর্চি জর্দা আনতে গিয়ে মারা গেছে নাকি কে বলবে!

আমাকে চিনেছেন? আমার নাম জীবনলাল।

ধনু শেখ ভীত গলায় বললেন, চিনেছি।

এই সময় বাবুর্চি জর্দা এবং হুঁকো নিয়ে ঢুকল। শোবার ঘরে অচেনা এক লোক বসে আছে এই নিয়ে তাকে মোটেই চিন্তিত মনে হলো না। সে ব্যস্ত হুঁকো ঠিক করতে। জীবনলাল বললেন, আপনার হুঁকোবরদারকে যেতে বলুন। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। কথা শেষ করি।

ধনু শেখ বাবুর্চিকে চলে যেতে ইশারা করলেন। বাবুর্চি চলে গেল। ধনু শেখ চাচ্ছিলেন বাবুর্চি যেন পুরোপুরি না যায়। দরজার পাশে থাকে। ডাকলেই ছুটে আসতে পারে এমন। কিন্তু হারামজাদা যে যাচ্ছে যাচ্ছেই। একবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছেও না। ধনু শেখের নিজেকে খুবই অসহায় লাগছে। পিস্তলের লাইসেন্স তিনি কমিশনার সাহেবের কাছ থেকে পেয়েছেন। আলসেমি করে পিস্তল কেনা হয় নাই। বিরাট বোকামি হয়েছে।

খান সাহেব, আছেন কেমন?

ধনু শেখ ক্ষীণগলায় বললেন, ভালো। আপনাকে একটা কথা আগেই বলা দরকার। আগে না বললে আপনি ধারণা করতে পারেন আমি ঐ রাতে খবর দিয়ে পুলিশ এনেছিলাম। ঘটনা সত্যি না। তবে পুলিশের চাপে পড়ে ঐ দিন স্বীকার করেছিলাম যে আপনি হাওরের দিকে গিয়েছেন। পুলিশের চাপ কী জিনিস আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

জানি। পুলিশের চাপের প্রসঙ্গ থাক। এখন আমার চাপটা শুনুন। মন দিয়ে শুনতে হবে।

মন দিয়ে শুনছি।

আপনি কাল পরশুর মধ্যে বান্ধবপুর যাবেন। হরিবাবুর বিষয়সম্পত্তি যা দখল করেছেন সেসব ফেরত দিবেন।

কাকে ফেরত দেব ?

মূল মালিককে দেবেন।

মালিকটা কে ?

মাওলানা ইদরিসকে জিজ্ঞাস করলেই জানতে পারবেন।

মাওলানা ইদরিসকে কী জিজ্ঞাস করব ? তার তো মাথা নষ্ট। পুরাই নষ্ট।

হরিচরণের জমিজমার ওয়ারিশানের নাম জহির। তার মা'র নাম জুলেখা।

ধনু শেখ বললেন, কোনো একটা গণ্ডগোল হয়েছে। হরিচরণ বাবু বেশ্যাবেটির ছেলেকে সম্পত্তি কেন দিবেন ? যদি দিয়ে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে উনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মাথাখারাপ মানুষের দলিল গ্রাহ্য না। ভালো কথা, আপনি কি খাওয়াদাওয়া করবেন ? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে ক্ষুধার্ত। বাবুর্চিকে খানা লাগাতে বলব ?

জীবনলাল চাদরের নিচ থেকে পিস্তল বের করে নিজের হাঁটুর উপর রাখতে রাখতে বললেন, আপনার বাবুর্চিকে খাবার গরম করতে বলুন। খাওয়া শেষ করে বিদায় নেবার সময় আপনার পায়ে একটা গুলি করব। আপনি মরবেন না, তবে পায়ের হাড্ডি চুরমার হবে। এই কাজটা করব যাতে আপনি বুঝতে পারেন আমি সহজ পাত্র না।

ধনু শেখ হাসির চেষ্টা করতে করতে বললেন, এইসব কী বলেন ? আপনার কথামতোই কাজ হবে। যা বলবেন তাই করব। আপনার নিজের যদি টাকা পয়সা লাগে সেটাও বলেন। স্বরাজ করতে টাকা লাগে। টাকা ছাড়া কিছুই হয় না।

জীবনলাল হাই তুলতে তুলতে বললেন, গুলি খাওয়ার পরই আপনি আমার কথামতো কাজ শুরু করবেন। তার আগে না। ভয় পাবেন না, আপনার বাড়ি থেকে হাসপাতাল দূরে না। অল্প সময়েই হাসপাতালে পৌঁছতে পারবেন। আরেকটা কথা, গুলি যে আমি করেছি এটা পুলিশকে না বললে ভালো হয়।

ধনু শেখ বললেন, ভাই সাহেব, খাওয়াদাওয়া করেন। আপনি ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার্ত অবস্থায় কী বলতেছেন নিজেও বোধহয় জানেন না। রহমত কই ? বাড়িতে অতিথি। খাবারের ব্যবস্থা কর।

ভাই সাহেব, আপনি কি রাতে আমার এখানে থাকবেন ? থাকতে পারেন। দুইটা ঘর সাজানো আছে। খাওয়াদাওয়া শেষ করে আসেন দুই ভাই মিলে পুরানা দিনের মতো গল্প করি। মাওলানা মাথা খারাপ হবার পরে কী করে আপনারে বলব, আপনি যদি মজা না পান দুই কান কাইট্যা ফেলব।

জীবনলাল তাকিয়ে আছে। তার চোখ শান্ত। ধনু শেখ বললেন, দাড়ি ফেলে দিয়ে ভালো করেছেন। আপনার চেহারা সুন্দর। দাড়ির কারণে আগে বুঝতে পারি নাই। আপনার ভাগ্যও কিন্তু ভালো। আজ বাড়িতে মাগুল মাছ রান্না হয়েছে। মাগুল মাছের নাম শুনেছেন ?

না।

অনেকে বলে মহাশোল। রুই মাছ, তবে দেখতে শউল মাছের মতো। পাহাড়ি নদীতে থাকে, দু'একটা নিচে নেমে আসে। এই মাছ একবার খেলে বাকি জীবন মুখে লেগে থাকবে। ভালো কথা, দেশ স্বাধীনের দেরি কত ?

দেরি নাই।

আমারও সেইরকমই ধারণা, দেরি নাই।

ধনু শেখ ভরসা ফিরে পাচ্ছেন। জীবনলাল গল্পগুজবে অংশ নিচ্ছে, এটা শুভ লক্ষণ। খাওয়াদাওয়া করার পর পেট শান্ত হবে। পেট শান্ত হলেই মাথা শান্ত। কিছু করবে বলে মনে হচ্ছে না। পিস্তল এনেছে ভয় দেখাবার জন্যে। এর বেশি কিছু না।

ধনু শেখের সমস্ত অনুমান মিথ্যা প্রমাণ করে জীবনলাল ঠাণ্ডা মাথায় কাছ থেকে পায়ে গুলি করল। ছিটকে পা সরিয়ে নিতে গিয়েও লাভ হলো না, পায়ের হাড় ভেঙে গুলি বের হয়ে গেল।

কবিরাজ সতীশ ভট্টাচার্যের কন্যার বিষয়ে আজ সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সমাজপতিরা সবাই এসেছেন। মুসলমানদের মধ্যে আছেন মাওলানা ইদরিস। ন্যায়রত্ন রামনিধিও আছেন। মূল সিদ্ধান্ত তিনি দেবেন। রামনিধির শরীর খুবই খারাপ, তারপরেও গুরুতর এই বিষয়ে তাঁকে আসতেই হয়েছে।

ঘটনা এরকম— কালবোশেখী ঝড়ের সময় যমুনা ঘোষবাড়ির আমবাগানে আম কুড়াতে গিয়েছিল। শুরুতে ঝড় তেমন কিছু ছিল না— এলোমেলো বাতাস। হঠাৎ ঝড় প্রবল হলো। সঙ্গে তুমুল বর্ষণ। যমুনা দৌড়ে ঢুকল ঘোষবাড়িতে। ঝড় বাড়তেই থাকল। বিপদের উপর বিপদ। এই সময় ঘোষবাড়িতে ডাকাত পড়ল। তারা চিৎকার চেঁচামেচি করছে, কেউ শুনছে না। ডাকাতির শেষে ডাকাতরা যমুনাকে ধরে নিয়ে গেল। তাকে উদ্ধার করা হয় শেষ রাতে উলঙ্গ অবস্থায়।

রামনিধি বললেন, এ তো মহাসর্বনাশ। কবিরাজ, তোমার মনে কী আছে বলো। মেয়েরে কী করবা ?

সতীশ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

রামনিধি বললেন, এই মেয়ে নিজ দোষে দোষী না। তস্করের কারণে দোষী। যে ঘটনা ঘটেছে তাতে তার গর্ভ সঞ্চারের সমূহ সম্ভাবনা। সেটা কোনো বিষয় না, গর্ভ নষ্ট করা যায়। কিন্তু মেয়ে যে পতিত হয়েছে তার গতি কী ?

সমাজপতিদের একজন মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, কোনো গতি নাই।

রামনিধি বললেন, কঠিন বাস্তবতা হলো সমাজ এই মেয়েকে গ্রহণ করবে না। আত্মীয়স্বজন গ্রহণ করবে না। সে যেখানে যাবে যার কাছে যাবে সে পতিত হবে। তার ইহকাল পরকাল সবই শেষ।

সমাজপতিদের মধ্যে বিশিষ্টজন বিধান বাবু বললেন, মেয়ের বয়স অল্প এবং সে সুন্দরী বিধায় সমস্যা আরো প্রকট।

সতীশ কবিরাজ চোখ মুছতে মুছতে বললেন, ফাঁসিতে ঝুলায়া মাইরা ফেলি ?

বিধান বাবু বললেন, বোকার মতো কথা বলবা না। ফাঁস নিয়া মরলে অসুবিধা আছে। থানা পুলিশ হবে। তোমারে ধরবে। একটা কাজ করা যায়, মেয়ের মাথা কামায়া তারে বাল বিধবা পরিচয়ে কাশিতে পার করা যায়। কাশি পূণ্যধাম। সেখানে রোজ গঙ্গাস্নান করলে এক পর্যায়ে পাপ কাটা যাবে।

সতীশ কবিরাজ বললেন, কাশিতে আমার কেউ নাই।

বিধান বাবু বললেন, আমি একটা প্রস্তাব দিতে পারি। শুনতে খারাপ লাগলেও প্রস্তাব উত্তম।

রামনিধি বললেন, কী প্রস্তাব ?

মেয়েটারে রঙিলাবাড়িতে পাঠায়ে দেওয়া। আমরা ধরে নিব যমুনা নামে কেউ সমাজে ছিল না।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে থাকল। মাওলানা ইদরিস বললেন, এটা আপনি কী বললেন ?

বিধান বাবু বললেন, অন্যায় কী বলেছি ? আপনার মুসলমান সমাজ কি এই মেয়েরে নেবে ? বলেন নেবে ? আপনি মুসলমান বানায়া এই মেয়েরে বিবাহ করবেন ?

মাওলানা বললেন, জনাব আমার স্ত্রী আছে। আমি কীভাবে বিবাহ করব ?

এক স্ত্রী আছে আরেক স্ত্রী হবে। আপনাদের সমাজে তিন চাইরটা স্ত্রী কোনো বিষয় না।

মাওলানা বললেন, আমার স্ত্রী রাজি হবে না। সংসারে সতীন তার পছন্দ না।

সমাজপতিদের কেউ কেউ হেসে উঠলেন। রামনিধি বিরক্ত গলায় বললেন, মূল বিষয়ে আস। খামাখা কথা বইলা সময় নষ্ট করার কিছু নাই। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সিদ্ধান্ত অতি অপ্রিয়, তারপরেও নিতে হবে। বিধান বাবুর কথা আমার পছন্দ হয়েছে। রঙিলাবাড়ি কিংবা এই ধরনের পতিত বাড়ি ছাড়া পতিত মেয়ের গতি নাই। আগের জন্মে এই মেয়ে বিরাট পাপ করেছিল বলে এই জন্মে শাস্তি। এই জন্মে শাস্তি ভোগের পরে পরের জন্মে সে উদ্ধার পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

কয়েকজন একসঙ্গে বলল, খাঁটি কথা।

যমুনা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নি। বাবার কাছ থেকে সামান্য দূরে মাথা নিচু করে বসেছিল। এইবার সে মাথা তুলে বলল, আমি রঙিলাবাড়িতে যাব না।

বিধান বাবু বললেন, তুমি কী করবা, কী করবা না এটা কেউ জিজ্ঞাস করে নাই। তুমি চুপ করে থাক।

যমুনা বলল, আমি রঙিলাবাড়িতে যাব না। বাবা, আমি রঙিলা বাড়িতে যাব না।

সতীশ কবিরাজ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, মা'রে চুপ করে থাক।

রামনিধি বললেন, আমার শরীর ভালো না। জ্বর এসেছে। সভা এইখানেই শেষ। মেয়ে নিজের ইচ্ছায় রঙিলাবাড়িতে যাবে না। যাওয়ার কথাও না। তাকে জোর করে দিয়ে আসতে হবে। সমাজ রক্ষার জন্যে এটা ছাড়া গতি নাই। ব্যবস্থা আজই নিতে হবে। অনেক দেরি হয়েছে আর দেরি করা যাবে না।

যমুনা এই সময় দৌড় শুরু করল। তাকে ধরার ব্যবস্থা নেয়ার আগেই সে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। যেখান থেকে প্রতি অমাবশ্যা রাতে হো হো শব্দ হয়।

সমাজপতিরা বিচলিত হলেন না। জঙ্গল থেকে যমুনাকে বের হতে হবে। কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। বের হলে ধরে বেন্ধে রঙিলা বাড়িতে পার করা। সেখানে মেয়ে কেনাবেচার ব্যবস্থাও আছে। ভালো মহাজন পেলে বিক্রি হয়ে যাবে। সেবাদাসী হিসেবে জীবন কেটে যাবে। আগের জন্মের পাপের শাস্তি তো নিতেই হবে।

যমুনা জঙ্গলে ঢুকেছে সন্ধ্যাবেলায়। বর্ষার জঙ্গলে নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরা করা অসম্ভব ব্যাপার। ঝোপঝাড়, কাটালতা। সাপে কাটার ভয় আছে। গরু-ছাগল জঙ্গলে ঢুকে অনেক সময় সাপের কামড়ে মারা গেছে। সাপখোপ ছাড়াও ভয় আছে। ভূতপ্রেতের ভয়। খারাপ বাতাসের ভয়। বিশেষ এক ধরনের অপদেবতা আছে যারা জঙ্গলেই বাস করে। এরা ভয়ঙ্কর। নিষ্ঠুরতা তাদের খেলা।

যমুনা জঙ্গলের অনেক ভেতরে ঢুকে পড়েছে। ঘন জঙ্গল। জঙ্গলে এক ধরনের কুয়াশা পড়ে, তার নাম জংলি কুয়াশা। দেয়ালের মতো এই কুয়াশায় কিছুই দেখা যায় না। হাতড়ে পথ চলতে হয়। দৌড়ে আসার কারণে যমুনা হাঁপাচ্ছে। গা দিয়ে গরম বাতাস বের হচ্ছে। তৃষ্ণায় কলজে ফেটে যাচ্ছে। তৃষ্ণার চেয়ে বেশি লেগেছে ক্ষুধা। তার কাছে মনে হচ্ছে, গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে সে এখন খেতে পারবে, তার কোনো সমস্যা হবে না। জঙ্গলের ভেতর মাধাই খালের একটা শাখা গেছে। পানি খেতে হলে খালটা খুঁজে বের করতে হবে। খালটা কোথায় কে জানে! যমুনা দম নেবার জন্যে বসে আছে। তার প্রায় গা ঘেঁসে একটা শিয়াল দৌড়ে গেল। তার ভয় পাওয়া উচিত, সে কেন জানি ভয় পেল না। মহাবিপদের সময় ভগবানকে ডাকতে হয়। সে ভগবানকেও ডাকল না। তার জীবন হঠাৎ করেই ভয়শূন্য এবং ভগবানশূন্য হয়ে গেল।

শশাংক পালের জীবন এখন হয়েছে ভগবানময়। তিনি সময় পেলেই ভগবানকে ডাকছেন। তাঁর শরীরের অবস্থা আরো খারাপ করেছে। তিনি এখন উঠে বসতেও পারেন না। সারাক্ষণ শুয়ে থাকতে হয়। তাঁর পা ফুলে পানি এসেছে। নিজের পায়ের দিকে তাকালেই ভয়ে তাঁর শরীর কাঁপে। পায়ের দিকে তাকালেই মনে হয়, মৃত্যু দ্রুত এগিয়ে আসছে। ভগবান ছাড়া গতি নেই। ভগবান দয়া করলেই বৈতরণী পার হওয়া যাবে। ভগবান দয়া করবেন এমন মনে হচ্ছে না।

শশাংক পালের ছোট শ্যালক এসেছে জামাইবাবুর খোঁজে। ছোট শ্যালকের নাম পরিমল। তার নানান ব্যবসা আছে। পয়সাকড়ি ভালোই করেছে। তবে টাকা-পয়সার প্রকাশ নেই। সে হিসেবি ব্যবসায়ী।

পরিমল বলল, জামাইবাবু, আপনার একী অবস্থা!

শশাংক পাল বললেন, অবস্থা খারাপ কী ? শুয়ে আছি। দিনরাত শুয়ে থাকার ভাগ্য সবার হয় না। আমার হয়েছে।

চিকিৎসা করাচ্ছেন ?

সর্ব চিকিৎসা শেষ হয়েছে। এখন চলছে 'কেরোসিন' চিকিৎসা।

'কেরোসিন' চিকিৎসাটা কী ?

রোজ দুই চামচ করে কেরোসিন খাচ্ছি। কেরোসিন হলো বিষ। আমার উদরে আছে বিষ। বিষে বিষক্ষয়।

আমার সঙ্গে চলেন। দিদি আপনাকে নিতে বলেছে।

শশাংক পাল বললেন, সে বাঁশি বাজিয়েছে বলেই আমি দৌড় দিয়ে চলে যাব! সে শ্রীকৃষ্ণ না, আর আমিও রাধিকা না।

ভিক্ষুকের মতো পরের বাড়িতে থাকবেন ?

শুধু যে ভিক্ষুকের মতো থাকব তা-না, ভিক্ষাবৃত্তিও শুরু করব। একটা ঘোড়া কিনব, তারপর ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা।

আপনি সত্যি যাবেন না ?

না।

কিছু টাকা-পয়সা এনেছিলাম।

কত ?

একশ'।

সারাজীবন তোমাদের টাকা-পয়সা দিয়েছি, আজ একশ' টাকা নিয়ে হাত গান্ধা করব না। টাকা নিয়ে বিদায় হও।

চলে যাব ?

সেটা তোমার বিবেচনা। আমোদ ফূর্তি করতে চাইলে রঙিলা বাড়িতে চলে যাও। আমাকে একশ' টাকা দিয়ে নষ্ট করার চেয়ে একশ' টাকার আমোদ কিনে নাও। দুই রাত থাকবা, খরচ হবে পঞ্চাশ। মদ্যপান করবা। খাওয়া-দাওয়া করবা। বখশিশ। এতে খরচ করবা পঞ্চাশ। একশ' টাকার হিসাব পেয়েছ ?

জামাইবাবু আমি যাই ?

যাও যাও। ভাগো।

দিদিকে কিছু বলব ?

বলবা যে জামাইবাবু তোমাকে প্রতিদিন স্নানের আগে এক চামচ করে বিষ্ঠা খেতে বলেছে। বিষ্ঠা শরীরের জন্যে ভালো। গ্রামের কুকুর এত মোটাতাজা কীভাবে থাকে ? বিষ্ঠা খেয়ে। তুমিও খেয়ে দেখতে পার। তোমার শরীরও দুর্বল। দুর্বল শরীরের জন্যে বিষ্ঠা মহৌষধ।

পরিমল জামাইবাবুকে প্রণাম না করেই বিদেয় হলো।

শশাংক পাল সুখেই আছেন। মনটা কয়েকদিন সামান্য খারাপ, কারণ সুলেমান ভিক্ষা করতে গিয়ে ফিরছে না। চারদিন হয়ে গেল। দূরে ভিক্ষা করতে গেলে ফিরতে এক দুই দিন দেরি হয়। তবে এতদিন অনুপস্থিতি এই প্রথম। শশাংক ঠিক করে রেখেছেন, এবার সুলেমান ফিরলে তার ঘোড়ায় চড়ে তিনি প্রতিদিনই খোলা হাওয়ায় কিছুক্ষণ ঘুরবেন। স্বাস্থ্যের জন্যে খোলা হাওয়ায় ঘোরাঘুরি অত্যন্ত উপকারী। তবে ঘোড়ার পিঠে সোজা হয়ে বসে থাকতে পারবেন না। ঘোড়ার গলা জড়িয়ে শুয়ে পড়তে হবে।

এক সপ্তাহ শেষ হলো, সুলেমান ফিরল না। শশাংক পাল যখন চিন্তায় অস্থির তখনই তিনি ধনু শেখের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলেন। কোলকাতা থেকে পাঠানো চিঠিতে ধনু শেখ লিখেছেন—

শ্রী শশাংক পাল

জনাব,

বিশেষ কারণে পত্র দিলাম। পত্রের নির্দেশ মোতাবেক কার্য করিবেন। আমার শরীর ভালো না। এক দুর্ঘটনায় পায়ে আঘাত পাইয়াছিলাম। আঘাতে পচন ধরিবার কারণে শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে পা কাটিয়া বাদ দিতে হইয়াছে। রোগ এখনো আরোগ্য হয় নাই। চিকিৎসা চলিতেছে।

এখন মূল বিষয়ে আসি। হরিচরণের বিষয়সম্পত্তির অধিকার আমি বিশেষ কারণে পরিত্যাগ করিয়াছি। সম্পত্তির প্রকৃত ওয়ারিশান পাওয়া গেলে তাহাতে সব কিছু বর্তাইবে। ওয়ারিশান পাওয়া না গেলে সরকার বাহাদুর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। এতদিন আপনি ভোগদখল করিলেন। নায়েবকে আমি এই বিষয়ে পত্র দিয়াছি। সে আপনাকে হিসাবপত্র বুঝাইবে।

আমি সহসা বান্ধবপুরে আসিব এইরূপ মনে হইতেছে না। আর যদিও আসি হরিচরণের বাড়িঘরে উপস্থিত হইব না। আপনি বিবেচনা মতো কার্য করিবেন।

ইতি

খান সাহেব ধনু শেখ

কলিকাতা

শশাংক পাল চিঠি পড়ে কিছুক্ষণ ঝিম ধরে বসে রইলেন। তারপর ডেকে পাঠালেন নায়েবকে। নায়েবের নাম বিনয়। সে নামের মতোই বিনয়ী। হরিচরণের (বর্তমান ধনু শেখের) জমিদারির দেখাশোনার প্রধান দায়িত্ব তার। কাজকর্মে অতি দক্ষ।

বিনয়!

জে আজ্ঞে।

খান সাহেবের কোনো পত্র পেয়েছ?

পেয়েছি।

বিষয় কিছু বুঝেছ ?

আজ্ঞে না। তবে বিষয় জটিল।

জটিল ভাবলেই জটিল। জটিল ভাববা না।

আপনে যেমন বলবেন।

ক্যাশে নগদ টাকা-পয়সা যা আছে আমার কাছে দিয়া যাবা।

যা বলবেন করব। চিঠিতে সেই রকম লেখা।

আমার জন্যে বিলাতি একটা বোতল জোগাড় করবা, রঙিলা বাড়িতে পাওয়া যাবে। নিজে যাইতে না চাও অন্যেরে দিয়া আনাইবা।

আচ্ছা।

রাতে মুরগির কোরমা আর পোলাও খাব। জামাইপছন্দ চাউল জোগাড় করতে পার কি-না দেখ।

আপনার শরীরের অবস্থা যেমন গুরুভোজন কি ঠিক হবে ?

আমার শরীর আমি বুঝব। তোমার চিন্তার কিছু নাই।

আচ্ছা।

একজন কর্মঠ কাউরে জোগাড় করো যার কাজ আমার সেবা করা। মেয়েছেলে হলে ভালো হয়। পুরুষমানুষ রোগীর সেবা করতে পারে না। মেয়েছেলে পারে। শরীর স্বাস্থ্য যেন ভালো থাকে। মুখের কাটিং ভালো হওয়া প্রয়োজন। বয়স হইতে হবে কুড়ির নিচে।

বিনয় হতাশ গলায় বলল, কই পাব এমন মেয়েছেলে ?

শশাংক পাল বললেন, নিচা জাতের মধ্যে খোঁজ। নিচা জাতের মধ্যে পাইবা। চণ্ডাল, হাড়ি, ডোম। এদের মেয়েছেলেদের শরীর স্বাস্থ্য ভালো হয়। এখন আমারে ধরাধরি করে আরাম কেদারায় শোয়ার ব্যবস্থা করো। শরীরটা আজ ভালো ঠেকতেছে।

বিনয় তাকিয়ে আছে। কী বলবে বুঝতে পারছে না। শশাংক পাল বললেন, এক মেয়ে শুনেছি জঙ্গলে পালায়া আছে, তার খোঁজ নিতে পার। আমার আশ্রয়ে থাকবে, অসুবিধা কী ?

বিনয় বলল, এইগুলা কী বলেন ?

শশাংক পাল বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি যা বলি চিন্তাভাবনা করে বলি। আমার শরীরে পচন ধরেছে, মনে পচন ধরে নাই। বুঝেছ ?

হুঁ।

সময় ফুরায়ে আসছে। আনন্দ ফুর্তি যা করার এখনই করতে হবে। হাতে সময় নাই। খাটিয়া ঘাড়ে নিয়া বল হরি হরি বলের সময় আগত।

শরীরটা ঠিক করেন। চলেন কইলকাতা যাই।

কইলকাতা যাব না। কইলকাতার ডাক্তার-কবিরাজ এইখানে নিয়া আস। সোনার মোহর দিয়া ভিজিট দিব। বুঝেছ ? এখন আমার টাকার অভাব নাই। রঙিলা বাড়ির জুলেখার খোঁজ্ পাও কি-না দেখ। প্রতি সন্ধ্যায় সে এই বাড়িতে গান করবে। টাকা-পয়সা যা লাগে দিব। নিয়মিত সঙ্গীত শুনলে শরীর আরোগ্য হয়। বুঝেছ ?

কিছু না বুঝেই বিনয় মাথা নাড়াল। সে বুঝেছে।

যমুনা বেতঝোঁপের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। ঝোঁপের কাঁটায় তার শাড়ি আটকে গেছে। হাত এবং গাল কেটেছে। তার মুখে নোনতা ভাব। কাটা গালের রক্ত গড়িয়ে ঠোঁট পর্যন্ত এসেছে। যমুনা অবাক হয়ে লক্ষ করল, রক্তের নোনতা স্বাদ তার খারাপ লাগছে না। সে ঝোঁপের পাশে বসে বেতকাটা থেকে শাড়ি ছাড়াবার চেষ্টা করছে। কাজটা সে করছে যত্ন নিয়ে এবং এই কাজটা করতেও তার ভালো লাগছে। কোনো কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকা।

জঙ্গলের অন্ধকার তার চোখে সয়ে এসেছে। আবছা আবছা ভাবে অনেক কিছুই চোখে আসছে। জোনাকি পোকার দল বের হয়েছে। অনেকগুলি ছোট ছোট দল। তারা মাঝে মাঝে একত্র হচ্ছে, আবার ছড়িয়ে পড়ছে। তাকে কে যেন বলেছিল জোনাকি পোকার দলের সঙ্গে মা লক্ষ্মী থাকেন। ঘরের বন্দিজীবন যখন তাঁর অসহ্য বোধ হয় তখন তিনি খোলা মাঠে বা জংলায় বেড়াতে বের হন। জোনাকি পোকারা হয় তাঁর খেলার সাথি। জোনাকিদের পেছনে পেছনে তিনি মনের আনন্দে নাচতে নাচতে ছুটেন।

যমুনা জোনাকির ঝাঁকের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করে বলল, মা লক্ষ্মী! আমি মহাবিপদে পড়েছি, আমাকে উদ্ধার কর।

যমুনার ঠিক মাথার উপরে একটা ডাল নড়েচড়ে উঠল। কিচকিচ শব্দ হলো। গাছের দিকে না তাকিয়েই যমুনা বুঝল বাঁদর। এই বনে বাঁদর আছে। হনুমানও আছে। এরা মানুষ ভয় পায় না। হনুমানও দেবতা। তার কাছেও প্রার্থনা করা যায়। যমুনা গাছের দিকে তাকিয়ে আবারো হাতজোড় করল।

আকাশে সন্ধ্যা থেকেই মেঘের আনাগোনা ছিল। এখন বিজলি চমকাতে লাগল। একেকবার বিজলি চমকায় বন আলোয় ঝিলমিল করে উঠে। বানর এবং হনুমানের দল ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে। বজ্রপাতের সময় বনে থাকতে নেই। তখন চলে আসতে হয় খোলা প্রান্তরে। তা না করে যমুনা খুঁজে পেতে লম্বা একটা তাল গাছের নিচে দাঁড়াল। তার মন চাচ্ছে এই গাছে একটা বজ্রপাত হোক। আকাশের বজ্র যখন নেমে আসবে তখন সে তালগাছ দু'হাতে জড়িয়ে ধরবে।

পুরো আকাশ ছিন্নভিন্ন করে বিদ্যুৎ চমকাল, আর তখনি যমুনা স্পষ্ট দেখল বেতঝোঁপের উল্টোদিকে কুজো হয়ে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। শুধু যে দাঁড়িয়ে আছে তা-না, হাত ইশারায় যমুনাকে ডাকছে। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার সারা শরীর চাদরে ঢাকা। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মানুষটা যে হরিচরণ এই বিষয়ে যমুনার কোনো সন্দেহ নেই। যমুনা অবাক হয়ে ডাকল, হরিকাকু!

ছায়ামূর্তি জবাব দিল না। আবারো হাত ইশারা করল। যমুনার মনে রইল না, মানুষটা জীবিত না। একজন মৃত মানুষ গভীর বনে উপস্থিত হতে পারে না। যমুনা মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগুচ্ছে। ছায়ামূর্তি সরে সরে যাচ্ছে। যতবার যমুনা থমকে দাঁড়াচ্ছে ততবার ছায়ামূর্তিও দাঁড়াচ্ছে। তাকে কি ভুলোয় ধরেছে? ভুলো ভয়াবহ জিনিস। সে প্রিয় মানুষের রূপ ধরে কাছে আসে। নাম ধরে ডাকে। তখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার পেছনে পেছনে যেতে হয়। একসময় ভুলো তার শিকারকে জলে ডুবিয়ে মারে।

যমুনা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, হরিকাকু আমার ভয় লাগছে। ছায়ামূর্তি জবাব দিল না। আবারো হাত ইশারায় ডাকল। বিদ্যুৎ চমকানোর সময় ছায়ামূর্তি স্পষ্টই দেখতে পাওয়ার কথা। তখন কিন্তু দেখা যায় না। তখন ছায়ামূর্তি বড় কোনো গাছের আড়ালে চলে যায়।

যমুনা ছায়ামূর্তি অনুসরণ করতে করতে জঙ্গলের শেষ সীমানায় চলে এলো। ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে পড়েছে। এখন সে আর যমুনাকে ইশারায় কাছে ডাকছে না। বরং আঙুলের ইশারায় বিশেষ এক দিকে যেতে বলছে। যমুনা ভীত গলায় বলল, হরিকাকু ভয় পাচ্ছি। ছায়ামূর্তি নড়ল না। জঙ্গলের উত্তর সীমানার দিকে আঙুল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাতাস দিচ্ছে, ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। যমুনা পায়ে পায়ে উত্তর দিকে এগুচ্ছে। হঠাৎ তার কাছে মনে হচ্ছে, যেদিকে সে যাচ্ছে সেদিকে শুভ কিছু তার জন্যে অপেক্ষা করছে। বনের বাইরে পা দিয়েই সে মাওলানা ইদরিসকে পেল। মাওলানার মাথায় ছাতা। হাতে হারিকেন। সারা শরীর কাদায় পানিতে মাখামাখি।

মাওলানা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এত সহজে তোমারে পাব ভাবি নাই। আল্লাহপাকের মেহেরবানি পেয়ে গেছি। এত বড় জঙ্গল, কোথায় খুঁজব? চল যাই।

যমুনা বলল, কই যাব?

মাওলানা বললেন, আমার বাড়িতে যাবা। তোমার ভাবি সাব, আমার স্ত্রী আমারে পাঠায়েছে। সে তোমার ঘটনা শুনে মিজাজ খারাপ করেছে। যে জীবনে

কোনোদিন উচা গলায় কথা বলে নাই সে আমাকে দিয়েছে ধমক। চিন্তা করেছ অবস্থা ?

যমুনা অবাক হয়ে লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে থাকা বিচিত্র মানুষটির দিকে তাকিয়ে আছে। মানুষটা এমনভাবে কথা বলছে যেন যমুনা তার অনেক দিনের চেনা।

মাওলানা বললেন, দাঁড়ায়া আছ কেন ? চল রওনা দেই। তোমার ভাবি চিন্তাযুক্ত আছে। মেয়েছেলেরে বেশি সময় চিন্তার মধ্যে রাখা ঠিক না। পুরুষমানুষ দীর্ঘ সময় চিন্তায় থাকতে পারে। মেয়েরা পারে না। তোমার কি ভুখ লেগেছে ?

হুঁ।

ঘরে যাবা। গরম পানি দিয়া গোসল দিবা, তারপরে গরম গরম খিচুড়ি খাবা। অমৃতের মতো লাগবে।

যমুনা বলল, আমাকে যে বাড়িতে নিতেছেন আপনার অসুবিধা হবে না ?

মাওলানা বললেন, অসুবিধা হলে হবে। কী আর করা! তোমারে জঙ্গলে ফালায়া গেলে তোমার ভাবি কী পরিমাণ বেজার হবে তুমি বুঝতেই পারবে না। আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিতে পারে। চল চল হাঁটা দাও। নাও ছাতিটা মাথার উপর ধর।

ছাতি লাগবে না।

তোমার কি গাল কেটেছে ? রক্ত পড়তেছে।

হুঁ।

কোনো চিন্তা নেই। তোমার ভাবি দূর্বা পিষে মলম বানায়ে দিবে। গালে দিলেই আরাম। এইসব টোটকা সে ভালো জানে। বুদ্ধিমতী মেয়ে, যেখানে যা দেখে শিখে রাখে। পরে কাজে লাগে।

যমুনা রওনা হলো। অনেক দুঃখের পর তার এখন হাসি পাচ্ছে। পাগল একজন মানুষের পেছনে পেছনে সে যাচ্ছে যার ধারণা ঘরে তার মমতাময়ী স্ত্রী। তাদের ভালোবাসা সুখের সংসার। আহারে!

যমুনা অনেক সময় নিয়ে সাবান ডলে গরম পানিতে গোসল করল। নতুন সুতির শাড়ি পরল। সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মাওলানার সঙ্গে খেতে বসল। যমুনা বলল, আপনি যে অচেনা মেয়েমানুষের সঙ্গে খেতে বসেছেন আপনার পাপ হবে না ? আপনাদের ধর্মে মেয়েছেলের মুখের দিকে তাকানো নিষেধ। ঠিক না ?

মাওলানা বললেন, তা ঠিক। তবে রোজ কেয়ামতের সময় পুরুষ রমণীতে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। তোমার এখন রোজ কেয়ামত।

আপনার স্ত্রী খাবেন না ?

মাওলানা হতাশ গলায় বললেন, এই তার এক অভ্যাস। একা খাবে। আমার সামনে খেতে লজ্জা পায়। কতবার তাকে বলেছি— বউ, আমি তোমার স্বামী। স্বামীর সামনে কিসের লজ্জা ? শোনে না।

যমুনা বলল, খিচুড়ি খুব স্বাদ হয়েছে। কে রেঁধেছে ? আপনি না বৌদি ?

তোমার ভাবি জোগাড়যন্ত্র করে দিয়েছে। আমি রেঁধেছি।

যমুনা বলল, যে দয়া আপনি আমাকে করেছেন তারচেয়ে অনেক বেশি দয়া ভগবান যেন আপনাকে করেন।

মাওলানা ব্যস্ত হয়ে বললেন, আমি কিছুই করি নাই। যা করার তোমার ভাবি করেছে। অতি আচানক মেয়ে। কেউ বিপদে পড়েছে শুনলে অস্থির হয়ে যায়।

যমুনা অনেক রাতে ঘুমাতে গেল। পরিপাটি বিছানা। গায়ে দেয়ার ধোয়া চাদর। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ। হঠাৎ করেই যমুনার মনে হলো, তার মতো সুখী মেয়ে এই পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। ঘুমের মধ্যে অতি আনন্দের একটা স্বপ্নও দেখল। স্বপ্নে সে এবং সুরেন বনে বেড়াচ্ছে। তাদের সঙ্গে চার-পাঁচ বছরের ফুটফুটে একটা মেয়ে। মেয়েটা তাদেরই। সে বড় দুষ্টুমি করছে। এই এক গাছের আড়ালে চলে গেল। ধরতে গেলে অন্য এক গাছের আড়ালে। সুরেন কপট বিরক্ত ভাব করে বলল, মেয়েটাকে এত দুষ্ট বানায়েছ কীভাবে ? যমুনা বলল, একা একা মেয়ে মানুষ করছি, দুষ্ট তো হবেই। তুমি থাক কলিকাতায়, আমি মেয়ে নিয়ে জঙ্গলে বাস করি।

জঙ্গলে বাস কর কেন ?

কেউ আমাকে বাড়িতে জায়গা দেয় না। জঙ্গলে বাস না করে করব কী ?

মাওলানা সাহেব তো তোমাকে জায়গা দিয়েছেন। টেলিগ্রামে খবর পেয়েছি।

ভুল খবর পেয়েছ। মাওলানা সাহেব এবং তার স্ত্রীকেও লোকজন তাড়িয়ে দিয়েছে। তিনিও এখন আমাদের সঙ্গে জঙ্গলে থাকেন। জঙ্গলে আমরা ঘর বানিয়েছি। কী যে সুন্দর ঘর। চল তোমারে দেখায়ে নিয়ে আসি।

আগে মেয়েটাকে খুঁজে বের কর। আমরা মেয়েটাকে ফেলে ঘর দেখতে যাব, সে যাবে হারিয়ে। আরেক যন্ত্রণা হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যমুনা মাওলানা ইদরিসের বাড়িতে থাকছে এ নিয়ে বান্ধবপুরে কোনো সমস্যা হলো না। মনে হলো মেয়েটার গতি হয়েছে এই ভেবে সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এক গভীর রাতে দেখা গেল মাওলানার বাড়ির উঠানে টিনের এক ট্রাংক। ট্রাংকভর্তি যমুনার জিনিসপত্র। শাড়ি, চুড়ি, গায়ের চাদর। স্যান্ডেল। তবে মাওলানা সামান্য বিপদে পড়ল। মুসুল্লিরা ঠিক করল তার পেছনে কেউ নামাজে দাঁড়াবে না। পাগল মানুষ ইমামতি করতে পারে না। তার পেছনে নামাজে দাঁড়ানো নাজায়েজ।

বান্ধবপুর জুম্মা মসজিদের জন্যে নতুন ইমাম এসেছেন। আব্দুল করিম কাশেমপুরী। তাঁর জন্মস্থান কাশেমপুরে বলেই কাশেমপুরী টাইটেল। তাঁর বয়স অল্প। তবে ভাবে ভঙ্গিতে অত্যন্ত কঠিন। প্রথম জুম্মার দিনেই তিনি মাওলানা ইদরিসকে নামাজ পড়তে দিলেন না। মাওলানা ইদরিসের অপরাধ, তিনি বাড়িতে যুবতী মেয়েমানুষ পুষছেন। এত বড় গুনার কাজ যে করে সে আমজনতার সঙ্গে নামাজে শরিক হতে পারে না। যুবতী বিদায় করে তওবা করতে হবে, তারপর বিবেচনা। খুতবা শেষ করে মাওলানা আব্দুল করিম কাশেমপুরী প্রথম ফতোয়া দিলেন—

> যে মুসলমানের স্ত্রীর চেহারা পরপুরুষ দিনে তিনবারের অধিক দেখে ফেলে তার বিবাহ বাতিল। তার সন্তানরা জারজ বলে গণ্য হবে।

মুসুল্লিরা হতভম্ব হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। মাওলানা আব্দুল করিম বললেন, বিধর্মীদের বিষয়ে সাবধান। তারা সাক্ষাৎ শয়তানের অংশ। শয়তানকে যেমন বিনষ্ট করা প্রয়োজন তাদেরও বিনষ্ট করা প্রয়োজন। কাফেরের বিষয়ে এছলাম ধর্ম কোনো ছাড় দেয় নাই। কাফের বিনষ্টে যে মুসলমান মৃত্যুবরণ করবেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে শহীদের দরজা পাবেন। তাদের স্থান হবে জান্নাতুল ফেরদৌসে। তাঁরা পরকালে নজিবী (দঃ)-র আশেপাশে থাকার পরম সৌভাগ্য লাভ করবেন। বলেন আল্লাহু আকবার।

মুসুল্লিরা আল্লাহ আকবর বললেন, তবে তাদের গলায় তেমন জোর পাওয়া গেল না।

মাওলানা আব্দুল করিম বললেন, যারা আমাদের ধর্মে থেকেও কাফেরদের মতো কাজ কারবার করেন, তারা অতি বড় কাফের এবং মোনাফেক। মোনাফেকদের জন্যে আছে কঠিন শাস্তি। আমাদের মধ্যে যারা মোনাফেক তারা সাবধান হয়ে যান। মোনাফেককে কেউ সাহায্য করবেন না। সমাজ থেকে তাকে আলাদা করে রাখবেন। যেমন মাওলানা ইদরিস। তাকে যে চাল-ডাল টাকা-

পয়সা দিয়ে সাহায্য করবেন তিনি তাঁর নিজের বিপদ ডেকে আনবেন। সবাই বলেন আল্লাহু আকবর।

মাওলানা ইদরিস মহবিপদে পড়লেন। তাঁর বেতন বন্ধ। গ্রাম থেকে খরচের চাল-ডাল আসা বন্ধ। এক রাতে ঘরে রান্না হলো না। মাওলানা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি সন্তুষ্ট যে আজ আমার ঘরে খানা নাই।

যমুনা বলল, আপনি সন্তুষ্ট কেন ?

মাওলানা বললেন, আমাদের নবিজির জীবনে কতবার এরকম ঘটেছে। ঘরে নাই খানা। এটা আল্লাহপাকের এক পরীক্ষা। সবেরে আল্লাহপাক এই পরীক্ষায় ফেলেন না। শুধু তাঁর পেয়ারা বান্দাদের এই পরীক্ষার ভেতর যেতে হয়।

যমুনা বলল, আমার চারগাছি স্বর্ণের চুড়ি আছে। বাজারে নিয়া বিক্রি করেন। চাল ডাল কিনেন।

মাওলানা হতভম্ভ হয়ে বললেন, এইটা তুমি কী বললা ?

যা বলেছি ঠিক বলেছি। একবেলা না খেয়ে থাকতে পারবেন, তারপরে কী হবে ?

রহমানুর রহিম ব্যবস্থা নিবেন। দেখবা সকালের মধ্যে সমস্যার সমাধান হয়েছে।

কীভাবে ?

কীভাবে জানি না। তবে সমস্যার সমাধান যে হবে এটা জানি।

যমুনা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনার মতো মানুষ যে দুনিয়াতে আছে এইটাই জানতাম না। আমি বড় কোনো পুণ্যের কাজ করেছি বলেই আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

মাওলানার সমস্যার সমাধান হলো পরদিন দুপুরের আগেই। বিচিত্র ভাবেই হলো। মাওলানা একশ এক টাকার একটা মনি অর্ডার পেলেন। টাকাটা পাঠিয়েছেন কোলকাতা থেকে ধনু শেখ। তিনি মনি অর্ডারের কুপনে লিখেছেন—

মাওলানা ইদরিস,

আসসালামু আলায়কুম। আমি যে মহাবিপদে পতিত হইয়াছি তাহার কোনো কূল কিনারা নাই। বিপদ হইতে উদ্ধারের কোনো আশা দেখিতেছি না। আমার পা যে কাটা গিয়াছে এই সংবাদ নিশ্চয়ই পাইয়াছেন। কাটা পায়ে পচন

ধরিবার কারণে আধ হাত উপরে আবার কাটিতে হইয়াছে। সেই স্থানেও পচন ধরিয়াছে। ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত নিয়াছেন আবার পা কাটিবেন। যে মহাযন্ত্রণায় আছি তার কোনো সীমা নেই। সর্বক্ষণ মনে হয় আমার কাটা পা কড়াইয়ের জ্বলন্ত তেলে ফুটিতেছে।

মাওলানা, আপনি সুফি মানুষ। আপনি আমার জন্যে কোরান খতম করিবেন এবং আমার রোগমুক্তির জন্যে খাস দিলে দোয়া করিবেন। মৃত্যু হইলে আমি রক্ষা পাই। কিন্তু আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।

ইতি

ধনু শেখ (খান সাহেব)

পুনশ্চ : লোকমুখে শুনিতেছি আমাকে খান বাহাদুর টাইটেল দিবার জন্যে সুপারিশ গিয়াছে। এই বিষয়েও পৃথকভাবে দোয়া করিবেন। মিলাদের আয়োজন করিবেন।

শশাংক পালের শারীরিক অবস্থাও ভয়াবহ। পায়ে পানি এসে ফুলে ঢোল হয়েছে। একেকবার তিনি নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেন। বিড়বিড় করে বলেন, হাতির পা নাকি ? এ্যাঁ হাতির পা ?

উদ্ভট উদ্ভট সব চিকিৎসার ভেতর দিয়ে তিনি এখন যাচ্ছেন। ফোলা পায়ে মৌমাছি হুঁল ফোটালে আরাম হবে। তিনি মৌমাছির সন্ধানে লোক পাঠিয়েছেন। কাচের বোয়মে কয়েকটা মৌমাছি ধরে আনাও হয়েছে। তিনি বোয়ামের খোলা মুখ পায়ে অনেকবার চেপে ধরেছেন। কোনো মৌমাছি হুঁল ফুটায় নি। হতাশ হয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন— বদ মৌমাছি! এইগুলারে পানিতে চুবায়া মারো। বোয়ামে পানি ঢেলে মৌমাছি চুবিয়ে মারা হয়েছে, তাতে তাঁর পায়ের সমস্যার কোনো সমাধান হয় নি।

মুখ থেকে রুচি সম্পূর্ণ চলে গেছে। জাউ ভাত হজম হয় না। টক ঢেকুর উঠে। বুক জ্বালাপোড়া করে। এর মধ্যে খবর পেয়েছেন মুসলমান বাড়ির বেশি করে তেল মশলা দেয়া মাংস খেলে রুচি ফিরবে। সেই চেষ্টাও করা হয়েছে। তার ফলাফল হয়েছে ভয়াবহ। ক্রমাগত দাস্ত হচ্ছে। সেবাযত্নের চূড়ান্ত করছে সুলেমান। দাস্ত পরিষ্কার করানো, গোসল করানো, পাখা দিয়ে বাতাস— সব একা করছে। এর মধ্যে সবচে' কষ্টকর কাজ হলো বাতাস করা। কোনো এক

বিচিত্র কারণে শশাংক পালের গায়ে সারাক্ষণ মাছি বসে। মাছি তাড়ানোর জন্যেই বাতাসের আয়োজন। সুলেমান শশাংক পালকে মশারির ভেতর রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল। শশাংক পাল রাজি হন নি। তাঁর নাকি দমবন্ধ লাগে। সুলেমান ক্লান্তিহীন বাতাস করে যায়, শশাংক পাল ক্লান্তিহীন কথা বলতে থাকেন। রোগের প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বেশি কথা বলার সমস্যা শুরু হয়েছে। তাঁর সব কথাই রোগব্যাধি নিয়ে।

সুলেমান!

জি কর্তা ?

আমার মরণ তাহলে ঘনায়ে আসছে। কী বলো ?

সেই রকমই মনে হয়।

গঙ্গাতে পা ডুবায়ে মরতে পারলে ভালো হইত। মৃত্যুর সাথে সাথে স্বর্গ। তোমাদের ধর্মে এই রকম কিছু আছে ?

না। তবে তওবা করলে কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে। তওবা করলে সব গুনা মাফ হয়ে যায়। এই জন্যেই আমাদের ধর্মে মৃত্যুর আগে আগে সবেই তওবা করে।

তোমাদের ব্যবস্থাও তো খারাপ না। শরীরে রোগ নিয়া গলায় পা ডুবায়া শুয়ে থাকার চেয়ে বিছানায় চাদর গায়ে দিয়ে তওবা কর।

কথা ঠিক।

তবে সুলেমান, আমি কিন্তু আরো কিছুদিন আছি। কীভাবে বুঝলাম শুনতে চাও ?

চাই।

মৃত্যুর আগে কিছুদিনের জন্যে মুখে রুচি ফিরে আসা। রোগী তৃপ্তি নিয়ে খাওয়া খাদ্য করে। আমার রুচি এখনো ফিরে নাই। কাজেই আছি আরো কিছুদিন।

ভালো বলেছেন কর্তা।

তোমার পুত্র যে নিরুদ্দেশ হয়েছে তার কোনো সন্ধান পেয়েছ ?

না।

মনে হয় না সন্ধান পাবা। অল্পবয়সে যারা গৃহত্যাগী হয় তারা আর ফিরে না। মধ্যবয়সে যারা ঘর ছাড়ে তারা কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে। কী জন্যে জানো ?

জি-না।

মধ্যবয়সে ভোগের জন্যে মায়া জন্মে। বুঝেছ এখন ?

জি।

তোমার ছেলের নামটা যেন কী ?

জহির।

সে ফিরে আসলে তার জন্যে সুসংবাদ ছিল। কিন্তু সে ফিরবে না, এটা একটা আফসোস।

অবশ্যই আফসোস।

দুটা নীল রঙের মাছি শশাংক পালের মুখের উপর ভোঁ ভোঁ করছে। বাতাসের ঝাপ্টায় তাদের কিছু হচ্ছে না। শশাংক পাল হতাশ চোখে মাছি দু'টার দিকে তাকিয়ে আছেন।

লাবুসের মা চরম হতাশা এবং বিরক্তি নিয়ে রান্নাঘরে বসে আছেন। কে একজন বিশাল আকারের এক বোয়াল মাছ দিয়ে গেছে। মাছ খাওয়ার মানুষ নেই— শূন্য বাড়ি। উকিল মুনসি গিয়েছেন নেত্রকোনার কেন্দুয়া। তাঁর শিষ্য জালাল খাঁর বাড়িতে। শিষ্য গুরুকে অতি আদরে নিয়ে গেছেন। গানবাজনার ফাঁকে গূঢ় তথ্য নিয়ে গোপনে আলাপ হবে। আলাপের বিষয় 'হাবলঙ্গে'র বাজার। সাধক বাউলরা 'হাবলঙ্গের বাজার' কথাটা মাঝে মাঝেই তাদের গানে ব্যবহার করেন। শ্রোতারা আর দশটা বাজারের মতোই হাবলঙ্গের বাজারকে দেখে। এর গূঢ় অর্থ জানে না। গূঢ় অর্থ সাধকরা জানেন। তাঁরা প্রকাশ করেন না। বাতেনি বিষয় সাধারণের কাছে প্রকাশ করতে নেই। জালাল খাঁ বিশেষ একটা গানের অর্থ নিয়ে অস্থিরতার মধ্যে আছেন। তিনি একভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যা সঠিক কি-না ধরতে পারছেন না। গুরুর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন। গানটা হলো—

'হাবলঙ্গের বাজারে গিয়া
এক টেকা জমা দিয়া
আনিও কন্যা কিনিয়া মনে যদি লয়'

হাবলঙ্গের বাজার যদি হয় শেষ বিচারের হাশরের মাঠ তাহলে সেখানে এক টাকা জমা দিয়ে কন্যা কেনার অর্থ কী ? 'কন্যা' মানে কি পুণ্য ? পুণ্য তো হাশরের মাঠে কেনা যাবে না। পাপ পুণ্যের বাজার তার আগেই শেষ।

লাবুসের মা কাঁচা টাকার মতো ঝকঝকে জীবন্ত বোয়াল মাছ থেকে চোখ ফেরাতে পারছেন না। মাছটা দেখলে যে দু'জন সবচে' খুশি হতো সে দু'জন নেই। একজন ফিরে আসবে, অন্যজন মনে হয় না ফিরবে।

মা!

লাবুসের মা চমকে পেছনে তাকালেন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়েছে। কারণ তাঁর ঠিক পেছনে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে লাবুস দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখভর্তি ফিনফিনে দাড়ি গোঁফ। চুল লম্বা হয়েছে। তার গায়ে হলুদ রঙের চাদর। চাদরটা পরিষ্কার। লাবুসের মুখ হাসি হাসি।

লাবুস বলল, বাঁটিতে সরিষার তেল দাও মা, সিনান করব। ঘরে সাবান আছে?

লাবুসের মা'র হতভম্ব ভাব কাটছে না। কত স্বাভাবিকভাবেই না এই ছেলে কথা বলছে। যেন সে কখনো বাড়ি ছেড়ে পালায় নি। আজ সকালে কাজে গিয়েছিল, দুপুরে খেতে এসেছে।

লাবুসের মা প্রাণপণ চেষ্টা করলেন নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে। ছেলে যেমন আচরণ করছে তিনিও সে রকমই করবেন। তিনিও ভাব করলেন যেন এই ছেলে ঘরেই ছিল। কখনো পালিয়ে যায় নি। লাবুসের মা স্বাভাবিক গলায় বললেন, উঠানে জলচৌকির উপর বোস। আমি গোসল দিব। গামছা সাবান নিয়ে যা। গরম পানি লাগবে?

না। মা, বোয়ালটায় বেশি করে কাঁচামরিচ দিও। তরকারিতে কাঁচামরিচের গন্ধ এত ভালো লাগে। কাগজি লেবুর গাছটা কি আছে মা?

আছে।

তরকারিতে লেবুর কয়েকটা পাতা দিয়ে দিও, আলাদা ঘ্রাণ হবে।

আর কিছু?

ধনিয়া পাতা দিও।

লাবুসের মা ফোড়ল দিয়ে ছেলের গায়ে সাবান ডলছেন। ছেলে চোখ বন্ধ করে মূর্তির মতো বসে আছে। লাবুসের মা'র মনে হচ্ছে, রোদে বৃষ্টিতে ছেলের গায়ের রঙের কোনো সমস্যা হয় নি। রঙ যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

মনে করে দাড়ি কামাবি।

আচ্ছা।

এতদিন পরে কী মনে করে ফিরলি?

স্বপ্ন দেখে মন অস্থির হয়েছে, এইজন্যে ফিরেছি।

কী স্বপ্ন দেখলি ?

হরিকাকাকে দেখলাম। উনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, এক্ষণ বাড়ি যা। এক্ষণ বাড়ি না গেলে মায়ের দেখা পাবি না। আমি ভেবেছিলাম দেখব তুমি মৃত্যুশয্যায়।

লাবুসের মা বললেন, দেখলি তো আমি ভালোই আছি। এখন কী করবি, আবার চলে যাবি ?

লাবুস শব্দ করে হাসল, যেন তার মা মজাদার কোনো কথা বলেছেন।

লাবুসের মা সেই দিন সন্ধ্যায় লাবুসের কোলে মাথা রেখে হঠাৎ করেই সন্ন্যাস রোগে মারা গেলেন।

ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। লক্ষণ ভালো না। খনা বলেছেন— 'যদি বর্ষে আগনে, রাজা যান মাগনে।' এখন অঘ্রাণ মাস। বৃষ্টির কারণে ধুম করে শীত নেমে গেছে। মাওলানার বাড়ির উঠানে বৃষ্টির পানি। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। বিকেলের দিকে বৃষ্টি ধরে এসেছিল, এখন আবার জোরে নেমেছে। পানি বরফের মতো বিঁধছে। শরীর কাঁটা দিয়ে উঠছে।

বৃষ্টি মাথায় করে এক লোক মাওলানার উঠানে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পায়ে গামবুট। মাথায় ছাতা। ছাতায় বৃষ্টি মানছে না। লোক গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, মাওলানা সাহেব আছেন ?

কেউ জবাব দিল না। তবে ঘরে মানুষ আছে বোঝা যাচ্ছে। দুটা কামরাতেই বাতি জ্বলছে। লোক বারান্দা থেকে উঠানে উঠে এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন।

মাওলানা সাহেব আছেন ?

দরজা সামান্য ফাঁক করে যমুনা উত্তর দিল, উনি বাড়িতে নাই।

তোমার নাম যমুনা ?

যমুনা ভীত ভঙ্গিতে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। লোক বললেন, আমি তোমাকে চিনি। তোমার কথা শুনেছি। মাওলানা সাহেব আমার পরিচিত। আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও। তোমার ভয়ের কিছু নাই।

যমুনা বলল, আপনার পরিচয় ?

পরিচয় জানতে চাও, না নাম জানতে চাও ? একেক সময় একেক নাম নিয়ে চলাফেরা করি। তোমাকে মূল নামটাই বলি। আমার নাম জীবনলাল। জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়। আমাকে কি চিনেছ ?

চিনেছি। আপনি ভিতরে আসেন।

আমাকে গা মোছার গামছা দাও। শুকনা কাপড় দাও। যে ঠাণ্ডা লেগেছে ঠাণ্ডায় মারা যাব। আমার সঙ্গে চা পাতা আছে। চা বানাতে পার ?

না।

জটিল রান্না না। গরম পানিতে পাতা ছেড়ে দেবে। পানিতে যখন রঙ ধরবে তখন ছেঁকে দিবে। চিনি দুধ থাকলে দিতে পার। না থাকলেও ক্ষতি নাই।

যমুনা অতি দ্রুত ব্যবস্থা করল। মাওলানার লম্বা পিরান এবং পায়জামা পরে জীবনলাল চৌকিতে বসে রইলেন। তাঁর সামনে মাটির মালশায় কাঠকয়লার আগুন। জীবনলাল আগুনে পা সেঁকছেন। তাঁর হাতে গ্লাসভর্তি চা। শেষ মুহূর্তে তিনি চায়ে আদা দিতে বলেছেন। আদার সুঘ্রাণ আসছে।

জীবনলাল বললেন, অতি আরামদায়ক অবস্থা। কিন্তু মাওলানা কোথায়?

যমুনা বলল, উনি তাঁর স্ত্রীকে স্নান করাতে নিয়ে গেছেন।

বিবাহ করেছেন না-কি?

না। উনার মাথায় সামান্য দোষ হয়েছে। উনার ধারণা বিবাহ করেছেন। তাঁর স্ত্রী আছে। স্ত্রীর সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলেন। মাঝে মাঝে রাতে স্ত্রীকে স্নান করাতে নদীতে নিয়ে যান।

আজও নদীতে নিয়ে গেছেন?

হুঁ।

অনেক রকম পাগলের কথা শুনেছি, এরকম শুনি নাই।

যমুনা বলল, বড়ই দুঃখী মানুষ। অনেকরাত পর্যন্ত জেগে থাকেন, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন।

জীবনলাল বললেন, উল্টাও হতে পারে। হয়তো উনি আনন্দে আছেন। কল্পনার স্ত্রী বাস্তবের চেয়ে ভালো হবার কথা।

যমুনা বলল, আপনি কি রাতে এখানে থাকবেন?

না।

খাবেন না?

না। রাতে শশাংক পালের বাড়িতে খাব। এবং রাতেই চলে যাব। যমুনা তুমি বলো— আমাকে দেখতে কি একজন মাওলানার মতো লাগছে?

যমুনা বলল, লাগছে। আপনার দাড়ি আছে, মাওলানার পোশাক পরেছেন।

ঘরে কি সুরমা আছে? সুরমা থাকলে চোখে সুরমা দেব।

সুরমা আছে। আতরও আছে।

যমুনা সুরমা এবং আতর এনে দিল। জীবনলাল বললেন, আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমার স্ত্রী হিসেবে তুমি বোরকা পরে যাবে। কোথায় যাবে সেটা বলব না।

যমুনা বলল, আপনার কথা বুঝতে পারছি না। আপনার সঙ্গে আমি কেন যাব ? পরিষ্কার করে বলেন।

জীবনলাল হাই তুলতে তুলতে বললেন, পরিষ্কার করে বলতে পারব না। আমি সুরেনের একটা পত্র নিয়ে এসেছি। পত্র পড়লেই বুঝতে পারবে। তুমি যদি রাজি থাক, আমি ভোর রাতে রওনা হব।

যমুনা হতভম্ব গলায় বলল, কার চিঠি এনেছেন ?

জীবনলাল বললেন, সুরেনের। সুরেনকে চেনো না ? এই নাও চিঠি। অন্য ঘরে নিয়ে পড়। আমার সামনে পড়তে হবে না। চিঠি শেষ করে আমাকে আরেক গ্লাস চা দিও।

যমুনা সুরেনের চিঠি নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেছে। তার হাত-পা কাঁপছে। বুক ধড়ফড় করছে। মনে হচ্ছে, সে যে-কোনো মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। চিঠিটা পড়তে পারবে না। জগতে এত বিস্ময়কর ঘটনাও ঘটে!

সুরেন লিখেছে—

যমুনা,

তুমি জানো না আমি বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েছি। নানান কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। তবে তোমার সব খবর পেয়েছি। যে ভয়াবহ সময় তুমি পার করেছ তা সমস্তই জানি। তখন কিছুই করতে পারছিলাম না। যে মাওলানা তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন তাঁকে আমার প্রণাম। যদি কখনো তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় তাহলে আমি অবশ্যই ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করব।

তোমাকে সাধারণ নিয়মে বিবাহ করার অনুমতি আমি আমার পিতা-মাতা এবং জ্ঞাতি গোষ্ঠীর কাছ থেকে পাব না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ব্রাহ্মমতে তোমাকে বিয়ে করব। বিশ্বাস করো, অতীতে তোমার জীবনে কী ঘটেছে তা আমার মাথায় নাই। কোনোদিন থাকবেও না। বিয়ের পর আমরা দুইজনেই দেশমাতৃকার চরণে জীবন উৎসর্গ করব। তুমি জীবনলালের সঙ্গে চলে আসবে। বন্দে মাতরম।

সুরেন

একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি মানুষ কতবার পড়ে ? বেশ কয়েকবার। যমুনা একবারই মাত্র চিঠিটা পড়ল এবং চিঠি মুঠিবদ্ধ করে বৃষ্টির মধ্যে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল। তার শরীর কাঁপছে। মনে হচ্ছে প্রচণ্ড জ্বর আসছে। কোনোকিছুই সে স্পষ্ট দেখতে পারছে না।

হরিচরণের কবরের পাশে হাঁটু গেড়ে যমুনা বসে আছে। মনে মনে বলছে, হরিকাকু, আমার জীবন যে এরকম হবে আমি জানতাম। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। সুরেনের চিঠি আপনাকে দেখানোর জন্যে আমি নিয়ে এসেছি। যমুনা কবরের দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে হাঁটু গেড়ে আছে। তার মাথার দীর্ঘচুল মাটিতে লুটাচ্ছে। তার শরীরে অঝোর ধারায় বৃষ্টির পানি পড়ছে। সে ঠিক করেছে, ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত সে এইভাবেই থাকবে। একচুলও নড়বে না।

মাওলানা ঘরে ফিরেছেন। জীবনলালের সঙ্গে আগ্রহের সঙ্গে গল্প করছেন। জীবনলাল বললেন, যমুনা মেয়েটা হঠাৎ করে কোথায় চলে গেল ? ডেকেও পাচ্ছি না। তার কাছে আরেক গ্লাস চা চেয়েছিলাম।

মাওলানা বললেন, সে তার ভাবির সঙ্গে গল্প করতেছে। মেয়েদের নিজেদের অনেক কথা থাকে।

আপনি আপনার স্ত্রীকে নদীতে স্নান করিয়ে এনেছেন ?

জি জনাব। হঠাৎ শখ করেছে নদীতে স্নান করবে। মেয়েদের ছোটখাটো শখ মেটানো উচিত। এতে নবিয়ে করিম (দঃ) খুশি হন।

ভাই, কিছু মনে করবেন না। আপনার তো খুব ভালো চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।

মাওলানা বললেন, আমার চিকিৎসা হওয়ার প্রয়োজন নাই জনাব। আমার শরীর ভালো আছে। শশাংক বাবুর চিকিৎসা দরকার, উনি বিরাট কষ্টে আছেন।

সবাইকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

মাওলানা বললেন, আপনার কথায় সামান্য ভুল আছে। এমন অনেক মানুষ আছেন, যারা কোনো পাপ করেন নাই। কিন্তু কঠিন কষ্টের ভেতর দিয়ে গিয়েছেন। আল্লাহপাকের অনেক ইচ্ছাই বুঝা মুশকিল। আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি অতি সীমিত। একটু বসেন, আপনার ভাবি সাহেব আমাকে ডাকে।

আমি কিন্তু কোনো ডাক শুনি নাই।

চুড়ির শব্দ করে ডেকেছে। মুখে কিছু বলে নাই। মেয়েদের গলার স্বর পরপুরুষের শোনা নিষেধ বলেই কথা বলে নাই।

জীবনলাল বললেন, বৌদি কী বলেন, শুনে আসুন।

মাওলানা চলে গেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হলেন। হাসিমুখে বললেন, আপনার ভাবি সাহেব আপনাকে খানা খেতে বলেছেন। আয়োজন সামান্য। আলুভর্তা। ডিমের সালুন। বেগুন দিয়ে ডিমের সালুন সে ভালো রান্না করে।

জীবনলাল বললেন, বৌদির রান্না আমি আরেকদিন এসে খেয়ে যাব। আমাকে এখন শশাংক পালের বাড়িতে যেতে হবে। উনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। খাওয়া-দাওয়া উনার ওখানেই করব।

আপনার ভাবি সাব মনে কষ্ট পাবেন।

আপনি বুঝিয়ে বলবেন। ভালো কথা, আমি আপনার জন্যে একটা উপহার এনেছি।

কী উপহার ?

আপনাকে বলেছিলাম, ভাই গিরিশের বাংলা কোরান শরীফ আপনাকে দেব। নিয়ে এসেছি।

আলহামদুলিল্লাহ। কী বলেন! আপনার মনে ছিল ? আমি নিজে ভুলে গিয়েছিলাম।

আমি ভুলি নাই। ভাই আমি উঠি। আপনি যমুনা মেয়েটিকে খুঁজে বের করুন। সকালে সে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে। তার অতি নিকট একজন তাকে গ্রহণ করেছেন। ব্রাহ্মমতে তারা বিবাহ করবে।

শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

শশাংক পালকে দেখে জীবনলাল সত্যিকার অর্থেই দুঃখিত হলেন। জড় পদার্থের মতো একজন মানুষ। সমস্ত শরীরে পানি এসেছে। চোখ ঘোলাটে। কথাবার্তা সম্পূর্ণ এলোমেলো। ক্ষণে ক্ষণে মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। জীবনলাল বললেন, আমাকে চিনেছেন ?

শশাংক পাল বললেন, কেন চিনব না ? আপনি বিশিষ্ট চিকিৎসক। আমার চিকিৎসার জন্যে এসেছেন। ঠিকমতো চিকিৎসা করেন। পয়গাম পাবেন সোনার মোহর।

আমার নাম জীবনলাল। জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়।

নামে কিছু যায় আসে না। আপনার পরিচয় আপনার চিকিৎসায়। বৃক্ষকে জিজ্ঞাস করা হলো, বৃক্ষ তোমার নাম কী ? বৃক্ষ বলল, ফলেন পরিচয়তে। অর্থাৎ ফলে পরিচয়। আপনার বেলাতেও তাই— আপনার পরিচয় চিকিৎসায়। চিকিৎসা কখন শুরু করবেন ?

আগে রোগ নির্ণয় করি, তারপর চিকিৎসা।

অতি সত্য কথা। তবে রোগ নির্ণয়ের কিছু নাই। আমার রোগের নাম মৃত্যুরোগ। মৃত্যুরোগের চিকিৎসা নাই এইটাও জানি। শুধু ব্যবস্থা করে দেন একবেলা যেন আরাম করে খেতে পারি। জামাইপছন্দ চালের পোলাও, ঝাল দিয়ে রান্না কচ্ছপের ডিম, মুরগি মোসাল্লাম। ভরপেট খাব। তারপর তেঁতুলের টক খাব জামবাটিতে এক বাটি। তেঁতুলের টকে জিরাবাটা দিতে হবে। সামান্য গোলমরিচ। গৌরীপুরের মহারাজার বাড়িতে একবার খেয়েছিলাম। স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে।

জীবনলাল বললেন, আপনার কি ধনু শেখের কথা মনে আছে ?

শশাংক পাল বললেন, কেন মনে থাকবে না! উনি বিশিষ্ট ব্যক্তি— খান সাহেব।

এখন আরো বিশিষ্ট হয়েছেন। এখন তিনি খান বাহাদুর। বলুন মারহাবা।

শশাংক পাল বললেন, মারহাবা।

উনার পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়েছিল। গ্যাংগ্রিন আরাম হয়েছে। এখন তিনি ঠ্যাং কাটা খান বাহাদুর।

শশাংক পাল আনন্দিত গলায় বললেন, আপনি উনার চিকিৎসা করেছেন ? আপনি তো মহাশয় ব্যক্তি। আমার চিকিৎসা শুরু করেন। আমার ধারণা আমার উদরি রোগ হয়েছে। যে চিকিৎসক খান সাহেব ধনু শেখকে আরোগ্য করেছে সে আমাকেও পারবে।

জীবনলাল বললেন, যত কঠিন রোগই আপনার হোক আপনাকে কিন্তু কাবু করতে পারে নাই। অন্যের জায়গা জমি দখল করে আরামে বাস করছেন। এই বিষয়সম্পত্তির মালিক কে বলুন তো দেখি ?

শশাংক পাল বললেন, মালিক কেউ না। মানুষ সামান্য দিন ভোগ করতে আসে। কেউ ভোগ করতে পারে কেউ পারে না। যার জমি তারই থাকে।

কথা মন্দ বলেন নাই। জীবনের শেষ পর্যায়ে সবাই ভালো ভালো কথা বলে।

শশাংক পাল বললেন, ভালো ভালো কথা বলে না। সাধারণ কথাই বলে। অন্যদের শুনতে ভালো লাগে।

জীবনলাল বললেন, আপনি কিন্তু আমাকে ঠিকই চিনেছেন। চিনেও না চেনার ভান করেছেন। মৃত্যুর কাছাকাছি সময়েও আপনার বুদ্ধি ঠিক আছে। সচরাচর এরকম দেখা যায় না। এখন বলুন আমাকে চিনেছেন না ?

হুঁ। আপনার বন্ধু শশী মাস্টার। তার কি ফাঁসি হয়েছে ?

হয়েছে।

শশাংক পাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মানুষটা ভালো ছিল। নিজের মনে গান করত, নিশি রাতে কলের গান বাজাত। জীবনের আনন্দ কিছুই দেখল না। ফাঁসিতে ঝুলে পড়ল। ভালো কথা, আপনি কি আমাকে শাস্তি দিতে এসেছেন ?

জীবনলাল বললেন, যে শাস্তি আপনি পাচ্ছেন তাই যথেষ্ট।

শশাংক পাল বলল, শুনে আরাম পেয়েছি। আপনাকে দেখে কলিজা নড়ে গিয়েছিল। ভাবলাম ধনু শেখ যেমন গুলি খেয়েছে, আমিও খাব।

জীবনলাল বললেন, আমার ক্ষুধা পেয়েছে। খাবারের আয়োজন করেন।

অবশ্যই। অবশ্যই খাওয়ার আয়োজন করব। সপ্ত ব্যঞ্জন থাকবে। নিজে খেতে পারি না তাতে কী। অন্যের খাওয়া আগ্রহ করে দেখি। কী খেতে চান বলেন ? কচ্ছপের ডিম খাবেন ? সংগ্রহ করে রেখেছি।

নিরামিষ খাব।

বিধবার খাবার খেয়ে কী করবেন ? এখনো হজমের ক্ষমতা যখন আছে— আরাম করে খান। যখন হজমের ক্ষমতা চলে যাবে তখন ঘাস লতাপাতা খাবেন।

জীবনলাল খেতে বসেছেন। আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন শশাংক পাল। যেন অতি আনন্দময় দৃশ্য দেখছেন। শশাংক পাল বললেন, খবরাখবর কিছু বলেন, আপনার কাছ থেকে শুনি। গান্ধিজি না-কি ডিগবাজি খেয়েছেন ?

জীবনলাল বললেন, ডিগবাজি খেয়েছেন কি-না জানি না, তবে অহিংস আন্দোলন থেকে উনার মন উঠে গেছে।

এটা ভালো না খারাপ ?

সময় বলবে ভালো না খারাপ।

আরেকটা যুদ্ধ নাকি হবে ?

হতে পারে। মানুষ যুদ্ধ পছন্দ করে। মুখে বলে শান্তি শান্তি। পছন্দ করে যুদ্ধ। তবে আনন্দের কথা, হিটলার সাহেব রাশিয়ার স্তালিনের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। এরা কেউ কারো বিরুদ্ধে কোনো দিন যুদ্ধ করবে না।

বাহ্ ভালো তো।

দুই পররাষ্ট্র সচিব চুক্তিতে দস্তখত করেছেন। জার্মানির পক্ষে রিবেনট্রোপ, রাশিয়ার পক্ষে মলোটভ। চুক্তি সইয়ের দশদিনের মধ্যে দুই দেশ পোলান্ড আক্রমণ করে পোলান্ড ভাগাভাগি করে নিয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগল বলে।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে আমরা কার পক্ষে থাকব ?

আমরা থাকব জাপানের সম্রাট হিরোহিতের পক্ষে। নেতাজির তাই ইচ্ছা। এশিয়ানরা থাকব এশিয়ানদের সঙ্গে।

শশাংক পাল বললেন, অবশ্যই। শরীরটা সুস্থ থাকলে আমি যুদ্ধে চলে যেতাম। সবই দেখা হয়েছে, যুদ্ধ দেখা হয় নাই। যুদ্ধ দেখার মধ্যেও মজা আছে। কী বলেন ?

জীবনলাল হেসে ফেললেন।

শশাংক পাল বললেন, খেয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন ?

পেয়েছি।

ধূমপান করবেন ? ভালো তামাক আছে। মেশক-এ-আম্বুরী।

জীবনলাল বললেন, ধূমপান করব না। আপনার আতিথেয়তায় আনন্দ পেয়েছি। আমি আপনাকে বিশেষ এক চিকিৎসার কথা বলতে পারি। চিকিৎসাটা করে দেখতে পারেন। রেইন ফরেস্টের পিগমী জাতীয় মানব গোষ্ঠীর কেউ কেউ জীবনের শেষ চিকিৎসা হিসেবে এই চিকিৎসা করেন।

শশাংক পাল আগ্রহ নিয়ে বললেন, চিকিৎসাটা কী বলুন। যত অর্থ ব্যয় হয় হবে। চিকিৎসা করব। টাকা এখন আমার কাছে তেজপাতা।

জীবনলাল বললেন, এই চিকিৎসায় কোনো খরচ নাই। আপনাকে একটা স্বাস্থ্যবান গাছ খুঁজে বের করতে হবে। তারপর নগ্ন অবস্থায় এই গাছ জড়িয়ে ধরতে হবে। বারবার বলতে হবে— হে বৃক্ষ, তুমি আমার রোগ গ্রহণ করে আমাকে রোগমুক্ত কর।

কতবার বলতে হবে ?

এর কোনো হিসাব নাই। দিনের পর দিন বলতে হবে। এক মুহূর্তের জন্যেও গাছের স্পর্শ থেকে দূরে থাকা যাবে না। কোনো খাদ্য খাওয়া যাবে না। পারবেন ?

পারব। নগ্ন হওয়া লজ্জার বিষয়। মরতে বসেছি, এখন আর লজ্জা কী ? আসছি নেংটা, যামু নেংটা। আপনি এখনি শুয়ে পড়বেন ? আসুন আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করি। রাতে আমার ঘুম হয় না। আগে মদ্যপান করে ঘুমাতাম, এখন মদ্যপানও করতে পারি না। আফসোস।

জীবনলাল বললেন, আমি রাতে থাকব না, চলে যাব। মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। জহির নামে কেউ যদি আসে তাকে বিষয়সম্পত্তি সব বুঝিয়ে দেবেন।

শশাংক পাল বললেন, অবশ্যই। অবশ্যই। মা কালীর চরণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলাম।

আমি কিন্তু আবার আসব।

যতবার ইচ্ছা আসেন। কোনো সমস্যা নেই। শশাংক পাল সারাজীবন এক কথা বলে।

হরিচরণের কবরের পাশে সকাল থেকেই জবুথবু হয়ে এক লোক বসে আছে। তার পা নগ্ন, চোখ রক্তাভ। মাথার চুল উসকু খুসকু। তার গায়ে হলুদ রঙের চাদর। চাদরের প্রায় সবটাই মাটিতে। কাদায় পানিতে মাখামাখি হয়ে আছে।

মসজিদের নতুন মাওলানা দৃশ্যটা লক্ষ করছেন। তিনি একসময় এগিয়ে এলেন। কঠিন গলায় বললেন, তুই কে ?

চোখ তুলে তাকাল। জবাব দিল না।

বোবা কালা না-কি ? তোর নাম কী ?

লাবুস।

তোর নাম লাবুস ? হিন্দু ?

মুসলমান।

দেখি চার কলেমা বল। শুনে দেখি মুসলমান কি-না। খৎনা হয়েছে ?

লাবুস বলল, তুই কে ?

মাওলানা করিম হতভম্ব। বদমাইশ তুই তুই করছে। এত বড় বেয়াদবি এর আগে তার সঙ্গে কেউ করে নাই। মাওলানা করিম বললেন, এখানে বসে আছিস কী জন্যে ?

আমার ইচ্ছা।

আমি জুম্মাঘরের ইমাম। আমার সঙ্গে ঠিকমতো কথা বল।

তুই আগে আমার সঙ্গে ঠিকমতো কথা বল। আদবের সঙ্গে কথা বল।

মাওলানা করিম বললেন, তুই তো বিরাট বেয়াদব। তোকে আগে কখনো দেখি নাই। তুই কোন গ্রামের ?

লাবুস বলল, আরেকবার আমারে তুই করে বললে টান দিয়ে তোর লুঙ্গি খুলে ফেলব।

কী বললি ?

কী বলেছি তুই শুনেছিস। আমি বলেছি আরেকবার আমাকে তুই বললে আমি টান দিয়ে তোর লুঙ্গি খুলব। তারপরেও তুই করে বলেছিস। এখন লুঙ্গি খোলার টাইম।

লাবুস উঠে দাঁড়াল। গায়ের চাদর খুলে পাশে রাখল। মাওলানা করিম আর এক মুহূর্তও দেরি করলেন না। বোঝাই যাচ্ছে এই লোক পাগল। পাগলকে বিশ্বাস নাই। মাওলানা করিম ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন। একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন না। পেছনে তাকালে দেখতেন তাকে কেউ অনুসরণ করছে না। লাবুস আগের জায়গাতেই বসে আছে। মাটিতে ফেলে দেয়া চাদর এখন তার গায়ে।

মাওলানা করিম সোহাগগঞ্জ বাজারের কাছাকাছি এসে থামলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর বুক ধড়ফড় করছে। এখন তিনি লজ্জার মধ্যে পড়েছেন। অনেকেই তাকে দৌড়াতে দেখেছে। তাদের মধ্যে নানান প্রশ্ন জাগবে। কী উত্তর দেবেন ? তাঁর লুঙ্গি খুলে ফেলবে এই কথা তো বলা যাবে না। তাঁর এখন অনেক ইজ্জত। লোকজন তাঁকে মানে। খুৎবার সময় যে কঠিন

বক্তৃতা দেন তা শোনে। দোজখের বর্ণনা তাঁর মতো কেউ দিতে পারে বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর সবচে' বড়গুণ দোজখের বর্ণনা দিতে দিতে ভয়ে অস্থির হয়ে কেঁদে ফেলা। নকল কান্না না। আসল কান্না। এই দৃশ্য বান্ধবপুরের কেউ আগে দেখে নি। তাঁর নাম ফাটছে। জুম্মাবারে দূর দূর থেকে লোকজন নামাজ পড়তে আসছে।

প্রথমবারের মতো তিনি উরসের আয়োজনও করছেন। উরস হবে মোহাম্মদ আহম্মদ সাহেবের (হরিচরণ) নামে। তিনি স্বপ্নে পেয়েছেন কবরে শায়িত এই ব্যক্তি অনেক বড় মর্যাদার আসন পেয়েছেন। উরসের তারিখ পড়েছে ২ ফাল্গুন। বৃহস্পতিবার। উরস উপলক্ষ্যে বড় বড় আলেমরা আসবেন। বয়ান হবে। পাক কোরানের তফসির করা হবে। খানা চলবে সারাদিন। রাত বারোটা এক মিনিটে আখেরি মোনাজাত হবে। মোনাজাত তিনি নিজে পরিচালনা করবেন।

যে মাওলানা অতি অল্পসময়ে বান্ধবপুরে এমন মর্যাদার আসনে চলে গেছেন তিনি লুঙ্গি খুলে ফেলার ভয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছেন এটা ভেবে মাওলানার চোখে পানি আসার মতো হলো। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, পবিত্র উরসের দিনে ব্যবস্থা নেয়া হবে। বদমায়েশটাকে এমন শাস্তি দেয়া হবে যা সে বাকি জীবন মনে রাখবে।

হলুদ চাদর গায়ে অচেনা এক লোক হরিচরণের বাগানে ঘুরঘুর করছে। শশাংক পালের বিরক্তির সীমা রইল না। বাগানে বাইরের লোক যেন না ঢুকে এমন নিষেধ দেয়া আছে। তারপরেও হুট হাট করে লোকজন কীভাবে ঢুকে ? শশাংক পাল লোকটিকে ডেকে পাঠালেন। কঠিন গলায় বললেন, নাম কী ?

লাবুস।

বাগানে ঘুরঘুর কর কেন ? কী চাও ? মতলব কী ?

কিছু চাই না। আমার কোনো মতলব নাই।

শশাংক পাল বললেন, ফালতু কথা বলবা না। চেহারা দেখেই বোঝা যায় তুমি মতলব নিয়া আসছ। পিতার নাম কী ?

সুলেমান।

শশাংক পাল কিছুক্ষণ পিটপিট করে লোকটির দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, তোমার আসল নাম কি জহির ?

লোকটি বলল, একসময় নাম জহির ছিল। এখন লাবুস।

লাবুস নামই ভালো। সবেরে এই পরিচয় দিবা। জহির পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নাই। তা বাবা তুমি দেশান্তরী ছিলা, সেইটাই তো ভালো ছিল। আবার কেন এসেছ ?

একটা কাজ সমাধা করার জন্যে এসেছি। কাজ সমাধা করে চলে যাব।

ভালো, খুবই ভালো। যাতায়াতের খরচ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে। কোনো অসুবিধা নাই। তা বাবা কী কাজ সমাধা করার জন্যে আসছ ? আপত্তি না থাকলে তুমি আমারে বলো।

আমি আমার মাকে খুন করতে আসছি। তার নাম জুলেখা।

শশাংক পাল বললেন, তাকে চিনি। ভালোমতো চিনি। তাকে খুন করার বাসনা হওয়া স্বাভাবিক। আমি তার পুত্র হলে আমিও এই কাজ করতাম। সে বান্ধবপুরে নাই। কলিকাতায় থাকে। কলিকাতায় গিয়া খোঁজ নাও। রাহাখরচ আমি দিতেছি।

আপনি কেন দিবেন ?

খুশি হয়ে দেব। তোমার পিতার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে, সেই দাবিতে দিব। তাছাড়া আমার শরীর খারাপ। দুই একদিনের মধ্যে জংলি এক চিকিৎসা শুরু করব। মরি না বাঁচি নাই ঠিক। কিছু দান খয়রাত এই কারণে করতে মন চায়। তোমারে দুইশ' টাকা দেই।

এত টাকা!

আচ্ছা যাও, আরো বাড়ায়া দিলাম। আড়াইশ'। তুমি আজই রওনা দিয়ে দাও।

ফাল্গুন মাসের দুই তারিখ মহা ধুমধামে উরশ শুরু হয়েছে। লালসালুর কাপড় দিয়ে পুরো অঞ্চল ঘিরে দেয়া হয়েছে। শত শত আগরবাতি জ্বলছে। দূর থেকে আতরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মঞ্চ করা হয়েছে। মঞ্চে দু'জন মাওলানা বসে আছেন। তৃতীয় একজন মাওলানার আসার কথা, তিনি এখনো এসে পৌছান নি।

শিন্নি গ্রহণ করার আলাদা জায়গা করা হয়েছে। গরু শিন্নি দেয়া নিষেধ (হরিচরণ নাকি স্বপ্নে এরকম নির্দেশই দিয়েছেন) বলেই খাসি, মুরগি, হাঁস

আসছে। একজন একটা মহিষ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মহিষের বিষয়ে কী করা হবে সেই সিদ্ধান্ত হচ্ছে না। প্রচুর লোকজন জড়ো হয়েছে, আরো আসছে।

হরিচরণের বাড়ির সামনেও কিছু লোকজন জড়ো হয়েছে। কারণ শশাংক পাল অদ্ভুত চিকিৎসা শুরু করেছেন। তার ধারণা এই চিকিৎসায় ফল হবে।

শশাংক পাল নগ্ন হয়ে হরিচরণের বাড়ির সামনের শিউলি গাছ জড়িয়ে ধরে বসে আছেন। তিনঘণ্টা পার হয়ে গেছে। দর্শনার্থীরা ব্যাপার-স্যাপার দেখে কিছুটা ভীত। সাহস করে কেউ কাছে আসছে না। শশাংক পাল সবাইকে ধমকাচ্ছেন— ভাগো। ভাগো। নেংটা মানুষ এর আগে কোনোদিন দেখো নাই ? বদের দল।

মওলানা ইদরিসও দেখতে গেলেন। তাঁর চোখে পানি এসে গেল। আহা বেচারা! তিনি ক্ষীণস্বরে বললেন, একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলে হয় না ?

শশাংক পাল ধমকে উঠলেন, ঢাকাঢাকি চলবে না, জংলি চিকিৎসার এইটাই দস্তুর।

মাওলানা বললেন, কিছু আরাম কি বোধ হচ্ছে ?

শশাংক পাল বললেন, এখনো কিছু বুঝতে পারছি না। বিষ পিঁপড়ায় কামড়াচ্ছে, এর একটা উপকার থাকতেও পারে।

বৃষ্টি হলে কী করবেন ?

ভিজতে হবে, কিছু করার নাই। বদ জংলিগুলা এই চিকিৎসা বের করেছে। থাপড়ায়া এদের দাঁত ফেলে দেয়া দরকার ছিল।

শশাংক পাল চোখ বন্ধ করলেন। কথা বলে নষ্ট করার সময় তার নেই। গাছের কাছে প্রার্থনায় যেতে হবে। হে বৃক্ষ! আমাকে রোগমুক্ত কর।

নগ্ন একজন মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকতে লজ্জা লাগছে। মাওলানা অন্যদিকে তাকিয়ে বসে আছেন। মানুষটার জন্যে তার হঠাৎ করে বড় মায়া লাগছে।

সন্ধ্যার আগেই বৃষ্টি নামল। শশাংক পাল ভিজছেন। মাওলানাও ভিজছেন। শশাংক পাল মহাবিরক্ত হয়ে বললেন, আপনার ঘটনা কী ? আপনি কেন ভিজতেছেন ? যান, বাড়িতে যান।

মাওলানা তারপরেও বসে রইলেন।

রাতের অন্ধকারে ঝুপঝুপ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কে একজন মাওলানা ইদরিসের বাড়িতে ঢুকেছে। কালো বোরকায় তার শরীর ঢাকা। মুখ খোলা, তবে মুখ ছাতায় ঢাকা। মহিলা বাড়িতে উঠে বাতি জ্বালাল। উঠানে রাখা কলসির পানিতে পায়ের কাদা মুছতে মুছতে নিচু গলায় গাইল—

যমুনায় জল নাই গো
জল নাই যমুনায়
আইজ রাধা কোনবা গাঙে যায়।

মহিলা কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে এসেছেন। তিনি পুঁটলি খুলে নতুন শাড়ি বের করলেন। শাড়ির রঙ কমলা। তিনি আয়নায় নিজেকে দেখে সামান্য হাসলেন। আর তখনি ছপছপ শব্দ তুলে উঠানে মাওলানা এসে দাঁড়ালেন। অভ্যাস মতো ডাকলেন, বউ!

বাড়ির ভেতর থেকে পরিষ্কার জবাব এলো, কী ?

মাওলানা চমকে উঠলেন। চমকে উঠার কোনো কারণ নেই। স্ত্রী ঘরে আছে, ডাকলে সে তো জবাব দেবেই। কিন্তু...

মাওলানা বললেন, বৌ একটা ঘটনা ঘটেছে।

'কী ঘটনা ?' বলে বাড়ির ভেতর থেকে জুলেখা বের হয়ে এলো। সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, ভেতরে আসেন, বলেন ঘটনা কী ? মন দিয়া শুনি।

মাওলানা অস্থির ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। কোথাও একটা সমস্যা হচ্ছে। সমস্যাটা বুঝতে পারছেন না।

জুলেখা বলল, এইভাবে তাকায়া কী দেখেন ?

মাওলান বিড়বিড় করে বললেন, বউ, আমার মাথায় কী জানি হয়েছে।

জুলেখা বলল, আমি খবর পেয়েছি। এখন আমি আপনার সঙ্গে আছি। আপনার মাথা আমি ঠিক করে দিব। ইশ, কী ভিজাই না ভিজেছেন! গরম পানি করে দেই, সিনান করেন।

মাওলানা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

সময় সেপ্টেম্বরের দুই তারিখ, ১৯৩৯, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড যুদ্ধ ঘোষণা করেছে জার্মানির বিরুদ্ধে। পৃথিবী অপেক্ষা করছে আর এক মহাযুদ্ধের জন্যে।

www.Murchona.com

মানবজাতি অপেক্ষা পছন্দ করে না। তারপরেও তাকে সবসময় অপেক্ষা করতে হয়। ভালোবাসার জন্যে অপেক্ষা, ঘৃণার জন্যে অপেক্ষা, মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা, আবার মুক্তির জন্যে অপেক্ষা।

শশাংক পাল যেমন গাছ জড়িয়ে ধরে অপেক্ষা করেন, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে ফাঁসির দড়ির দিকে তাকিয়ে বিপ্লবীরাও অপেক্ষা করেন। অপেক্ষাই মানবজাতির নিয়তি।

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

Maddhanya by Humayun Ahmed

Part-2

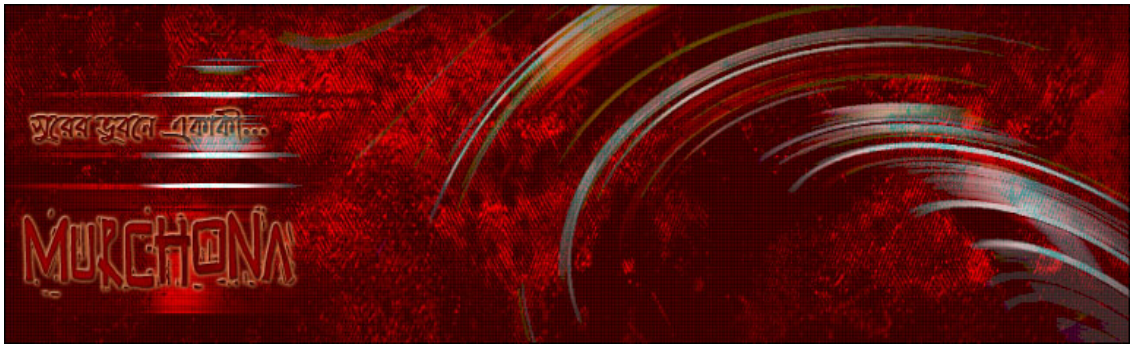

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http//www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com